হ্রস্ব ও দীর্ঘ

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

HRASWA O DIRGHA

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৭০

প্রকাশক ঃ
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রীআলোকময়

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স
২, ছিদাম মুদী লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

দুর্গাকে

পুরানো আমলের সাদা সাহেবেরা বলতেন—স্যুটীর। হাল আমলের কালো মনিবেরা ডাকেন—নোবীশ। আসলে নামটা সুধীর খাশনবীশ। কেরানীরা বলে—বাঁশনবীশ। অবশ্য আড়ালে। সামনে 'স্যার' ছাড়া অন্য কোন সম্বোধন করবে এমন বুকের পাটা নেই কারো।

এটাচড্ অপিসের লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক থেকে মিনিস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারী। শিলিগুড়ির সমতলভূমি থেকে প্রায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া, এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং-এর বেসমেণ্ট থেকে টেরেস। দুষ্প্রাপ্য প্রমোশনের সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ হয়েছেন খাশনবীশ। শত্রুপক্ষ নিন্দা রটায় —ইস্, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। অর্থী-প্রত্যর্থীর দল প্রশংসায় গদ গদ হয়ে বলে—ওহো, রিজেন ফ্রম দি র‍্যাঙ্কস্; কি অপূর্ব কর্মক্ষমতা।

লোকটা কাজের সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। বিদেশী ও স্বদেশী দুই রাজত্বেই সমান সুনাম আছে খাশনবীশের। উপরয়ালারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চুনি, পান্না বসানো জড়োয়া গয়নার মতো তাঁর কারেক্টার রোলগুলি 'হাইলী এফিসিয়েণ্ট', 'এক্সট্রিমলী ডিলিজেণ্ট' প্রভৃতি বাছা বাছা ইংরেজী বিশেষণের দ্যুতিতে ঝলমল।

সেটা কিছু অহেতুক নয়। সরকারী কাজে এমন অনন্যমতি অনুরাগ কদাচিৎ দেখা যায়। ঋতুভেদে সূর্যের উদয়-অস্তের তারতম্য ঘটে। শুধু খাশনবীশের আপিসে আসা-যাওয়ার সময়ের এদিক-ওদিক নেই। তাঁকে সকালে দশটার পাঁচ মিনিট আগে ছাড়া পরে আসতে কেউ কখনও দেখে নি। রাত সাড়ে সাতটার আগে বাড়ি ফিরেছেন এমন ঘটনা বিরল।

সেবারে খাশনবীশের ছেলের অসুখ। তিনদিন জ্বরের বিরাম নেই।

আপিসে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে আশ্বাস দিলেন বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় ডাক্তার নিয়ে ফিরবেন।

পিছনে খাস চাপরাশীর কাঁধে ফাইলের বোঝা সহ যখন বাড়ি এলেন রাত তখন প্রায় ন'টা।

স্ত্রীর কাছে এটা অভূতপূর্ব নয়। তিনি নিজেই ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলেন। পাণ্ডে ডাক্তার পরিবারের অনেক দিনের বন্ধু, প্রায় ঘরের লোকের মতো। চিকিৎসা এবং প্রয়োজন মতো মৃদু ভৎ'সনা দুইই করে থাকেন। অবাক হয়ে বললেন, 'বাড়িতে ছেলের এমন অসুখ, আর তুমি রাত নটা অবধি আপিস করছো? এ কী কাণ্ড?'

খাশনবীশ লজ্জিত স্বরে বললেন, 'বল কেন গেরো! পৌনে পাঁচটায় চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় জয়েন্ট সেক্রেটারী ডেকে বললেন —কাল সাড়ে দশটায় কমার্স মিনিস্ট্রিতে জরুরী মিটিং। নোট তৈরী করে সকাল সাড়ে আটটায় পৌঁছে দেওয়া চাই তাঁর বাড়িতে। দেখ দেখি একবার হুজুরের আক্কেল; মিটিং হবে, তা' সে কথা দু'দিন আগে বলবি তো। না একেবারে শিরে সংক্রান্তি! খোকা আছে কেমন? সিরিয়াস কিছু নয়তো?'

ডাক্তার সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, 'তাঁকে বলতে পারলে না যে তোমার ছেলের অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছ। তিনি তাঁর নোট অন্য আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতেন!'

'তিনি করিয়ে নেবেন? তবেই হয়েছে আর কি? গাড়ি নিয়ে সেজেগুজে মেমসাহেব আগে ভাগেই এসে বসে ছিলেন। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই হর-পার্বতী চলে গেলেন পার্টিতে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন খাশনবীশ।

সে হাসিতে কিছুমাত্র যোগ না দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'যার মিটিং তিনি গেলেন পার্টিতে, আর যার ছেলের অসুখ সে রইল তাঁর কাজ করতে। খুব চমৎকার ব্যবস্থা দেখছি।'

এবার গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন খাশনবীশ, 'আরে ভাই এ যে তোমাদের রঘুপতি রাঘব রাজা রামের রাজ্য। এখানে ঐ তো হয়েছে

রেয়াজ। সেক্রেটারিয়েটে পনের আনা লোকই কাজ করে না, কেবল গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। তাই যে দু-চারজন লোক খাটে তাদের একের ঘাড়ে দশের বোঝা চাপে। নাঃ, আর পারিনে, চাক্‌রি-বাক্‌রি ছেড়ে দিলে বাঁচি।'

বিরক্তিটা যে কপট, তা বুঝতে বাকী থাকে না কারো।

ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'রাখো তোমার ন্যাকামি। তুমি না থাকলে যেন গভর্নমেন্ট অচল আর দুনিয়া উল্টে যাবে।'

খাশনবীশের অভাবে গভর্নমেন্টের পতন এবং পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে এমন কথা তিনি বলেন না। তবে তিনি নজর না দিলে অসাবধান সেকশন অফিসার আর অপরিপক্ক আণ্ডার-সেক্রেটারীরা মিলে কোথায় যে কী ভালগোল পাকিয়ে রাখবে তার কিছু ঠিক আছে কি?

এ ধারণাটা শুধু খাশনবীশেরই নয়, তাঁর উপরয়ালাদেরও। তাঁরা জানেন, যে কোনো দুরূহ কাজের ভার খাশনবীশকে দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই সময়ে এবং অসময়ে তাঁরই ডাক পড়ে।

মেয়ের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন খাশনবীশ। দু'মাস, একমাসের আর্নড লীভ নয়। ক্যাসুয়েল। মোটে চারটি দিনের। পার্লামেন্টে বাজেট সেসান চলছে, এ সময়ে বেশী দিনের ছুটি চাইবেন কি করে? খাশনবীশের কি বিচার বিবেচনা নেই?

কিন্তু সে চারটি দিনেও সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। আপিস জড়িয়ে থাকে খাশনবীশের অদৃষ্টে।

বিয়ের দিন সকাল বেলায় পট্টবস্ত্র পরে কুশাসনে বসেছেন আভ্যুদয়িকে। পুরোহিতমশায় মন্ত্র পড়াচ্ছেন,—মধু বাতা ঋতায়তে ইত্যাদি। এমন সময় টেলিফোন আসে স্বয়ং সেক্রেটারীর কাছ থেকে। পার্লামেন্ট কোশ্চেনের ফাইল পেশ হয় নি মন্ত্রীর কাছে। যার ওপরে ভার ছিল সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছে হাসপাতালে। আজকের দিনে খাশনবীশকে ওয়ারী করতে হচ্ছে এজন্য তিনি অফুলী সরি: কিন্তু খাশনবিশ যদি কাইণ্ডলি—

'যদি'র কোনো অবকাশ নেই খাশনবীশের কাছে। তৎক্ষণাৎ

ফাইল হাতে স্টেনোগ্রাফার এল খাশনবীশের বাড়িতে।

উঠানে মেরাপ বাঁধা হচ্ছে। আত্মীয় বন্ধুরা কেউ তদারক করছেন ভিয়েনের, কেউ ছুটেছেন বাজারে, কেউ বা ফর্দ মিলিয়ে সন্দেশের থালা, দৈ-এর হাঁড়ি তুলছেন ভাঁড়ারে। স্বজনকুটুম্ব, ছেলেমেয়েদের কলকোলাহলে বিয়ে বাড়িতে কোথাও এতটুকু নির্জন জায়গা নেই। বারান্দার এক কোণে টুল পেতে বসে ওরই মধ্যে কন্যাকর্তা লোকসভার প্রশ্নের জবাব এবং 'নোট ফর সাপ্লিমেণ্টারী' লিখে দিলেন।

আশ্চর্য নয় যে আপিসে খাশনবীশের খাতির প্রচুর এবং প্রতিপত্তি প্রভূত। উপরস্থ কর্তারা তাঁকে যে পরিমাণ পছন্দ করেন, অধীন কর্মচারীরা ঠিক সেই পরিমাণে করে ভয়। নিজের ভুলচুক্ নেই; তাই অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে তিনি ক্ষমাহীন। না বলে কয়ে এক কেরানী ক'দিন অনুপস্থিত। সে আপিসে আসতেই তাকে লিখিত কৈফিয়ৎ দিতে হল। জ্বর হয়েছিল বললেই পার পাওয়া যায় না। অসুস্থতা অপরাধ নয়। অসুখ করলে কাজে না আসাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু নিয়ম অনুসারে ছুটির দরখাস্ত পাঠায় নি কেন? অফিস ডিসিপ্লীন নেই কি?

এক চাপরাশী কাবুলীয়ালার কাছে টাকায় চার আনা সুদে ধার নিয়েছিল। খাশনবীশ জানতে পেরে নিজে উদ্যোগী হয়ে আপিসে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক চালু করলেন। আপদে বিপদে গরীব কর্মচারীরা যাতে ঋণ পেতে পারে। কিন্তু চাপরাশীর সাস্পেনসন রোধ হল না। সরকারী কর্মচারীদের কণ্ডাক্ট-রুলস-এ ধার দেওয়া এবং নেওয়া দুই-ই নিষিদ্ধ। সেকথা তো ভুললে চলে না। খাশনবীশ নির্দয় নন, নিয়মনিষ্ঠ।

প্রতাপ শুধু আপিসেই সীমাবদ্ধ নয়, নিজের বাড়িতেও প্রসারিত। সাধারণতঃ সমাজে স্ত্রী-পুরুষের কর্তৃত্বের একটা এলাকা বিভাগ থাকে। স্বামী আপিস-আদালত, ব্যবসা বাণিজ্যে খাটেন, টাকা আনেন। স্ত্রী ঘরকন্না দেখেন, ছেলেমেয়ের, স্বামী-শ্বশুরের সেবাশুশ্রূষা করেন, গৃহে তাঁর শাসন নিরঙ্কুশ। সদর-অন্দরের এই কার্যবিভাগের ফলে সংসার-যাত্রাটা সুগম হয়।

কিন্তু খাশনবীশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইউনিটারী ছাড়া অন্য কোনো গভর্নমেণ্ট নেই। প্রভিন্সিয়েল অটোনমীতেও তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর স্ত্রী শৈলবালার আরাম আয়েসের আয়োজন ত্রুটিহীন। ঝি, চাকর, রাঁধুনি, মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটার কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু গৃহের কর্তৃত্ব গৃহিনীর হাতে নয়।

খাশনবীশ নিজে সেকরা ডেকে গিন্নীকে বারো ভরি সোনার বালা গড়িয়ে দেন। সে বালা মকরমুখের হবে কি বলপ্যাটার্নের হবে সে সিদ্ধান্তও করেন তিনিই। পূজাপার্বণে ফি বছর দামী বেনারসী, চান্দেরী কিনে আনেন দোকান থেকে। শীতের মরসুমে কেনেন শাল বা মলিদা। কিন্তু তার পাড় বা রং পছন্দ করার স্বাধীনতা নেই স্ত্রীর। আলমারীর চাবির গোছাটা ভদ্রমহিলার আঁচলে। কিন্তু সংসারের চাবিকাঠিটা তাঁর স্বামীর পকেটে।

এই নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্যের মধ্য দিয়েই কেটে গেছে এত কাল। কোনোখানে কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু নিচ্ছিদ্র পাথরের দেয়ালেও ফাটল দেখা দেয় একদিন, নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলেও ঢেউ ওঠে কখন কখনও।

ছুটির দিনে তুপুরের খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হয়েছে। পান চিবতে চিবতে একটা আরাম-কেদারায় আধশোয়া ভাবে বিশ্রাম করছিলেন খাশনবীশ। স্ত্রী ক'দিন থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সন্তর্পণে কথাটা পাড়লেন।

'এবার পল্টুর বিয়ে দিলে হয় না?'

পল্টু অর্থাৎ ছেলে। বাড়ির একমাত্র পুত্রসন্তান। বছর চব্বিশ বয়স। যেমন সুদর্শন, তেমনি মেধাবী। স্কুল কলেজে স্কলারশিপ পেয়েছে বরাবর। সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে সেখানেই হাউস-সার্জেন হয়েছে।

কথাটা খাশনবীশের মনেও উদয় হয়েছে বটে। বললেন, 'আমিও তাই ভাবছিলুম, সেদিন ভবেশ রায় বলছিল তার মেজ মেয়েটির কথা—'

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'রাম বল, সে-মেয়ে যেমন কালো

তেমনি বেঁটে, তাকে পল্টুর কখনও পছন্দ হবে না।'

পল্টুর পছন্দ অপছন্দের কথাটা অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। তবে কালো মেয়ে ঘরের বউ করা খাশনবীশের নিজেরও ইচ্ছা নয়। তাই এসম্বন্ধে তিনিও নিরুৎসাহ ছিলেন। বললেন, 'বিয়ের প্রস্তাব তো কতই আসছে। তার মধ্যে খুঁজে বেছে একটি ঠিক করলেই হবে।'

চতুর সেনাপতির সুকৌশল সৈন্যপরিচালনার মতো গৃহিনী এবার আলোচনাটা নিজের অভীষ্ট পথে টেনে আনলেন। বললেন, 'অত খোঁজাখুঁজির দরকার কী? আমাদের চেনা-জানা একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দিলেই তো হয়।'

চেনা-জানার মধ্যে মেয়ে নিশ্চয়ই আছে। হয়তো একটু অতিরিক্ত মাত্রাই আছে। কিন্তু ভাল মেয়ে বলতে বোঝায় কাকে? খাশনবীশ জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

স্ত্রী বেচারী এতক্ষণ ধরে যে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন খাশনবীশের দৃষ্টির প্রথম আঘাতেই তার অর্ধেক অন্তর্হিত হলো। কদিন ধরে নিজের মনে মনে সম্ভবপর কথাবার্তার একটা মহড়া দিয়ে রেখেছিলেন। কোন প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তা আগের ভাগেই ভেবেছিলেন। এখন তা সবই গুলিয়ে গেল। কোনোমতে তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, 'এই ধরো যেমন দীপালী, কিম্বা—' কথাটা নিজের কানেই বড় আচমকা ঠেকল। শেষ করতে পারলেন না।

খাশনবীশ খাড়া হয়ে বসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'দীপালী? সুরেন চৌধুরীর মেয়ে?'

স্ত্রী ঘাড় নেড়ে জানালেন, সে-ই।

'পাগল!' একটিমাত্র শব্দে সমস্ত নস্যাৎ করে দিলেন খাশনবীশ।

পরিবারের চিরাচরিত রীতিতে আলোচনাটার ঐখানেই ইতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। একবার ভয় ভেঙ্গে যেতেই শৈলবালার মনে আর দ্বিধা সঙ্কোচ রইল না। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন? আপত্তি কিসের? দীপালী দেখতে সুশ্রী, স্বভাবটি মিষ্টি। তার মা গরীব বটে, কিন্তু আমাদের তিনি কম উপকার করেন নি।'

সমস্তই সত্য। খাশনবীশের প্রথম কেরানী জীবনে দীপালীর মা-বাবা তাঁর পাশের বাড়িতেই থাকতেন। দীপালী মেয়েটি তখন সবে জন্মেছে। খাশনবীশের স্ত্রী তিন বছরের ছেলে কোলে নিয়ে প্রথম এলেন দিল্লী শহরে! সঙ্গে এনেছিলেন বাক্স, বিছানা, রান্নার বাসনপত্র ও দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া। কাঁপুনি-ধরা জ্বরে প্রায়ই বিছানায় পড়ে থাকতেন। অজ্ঞান-অচৈতন্য। বিদেশ বিভুঁই। মুখে জলটুকু দেওয়ার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। সে সময়ে দীপালীর মা-বাবা আপনজনের মতো দেখাশোনা সেবা-যত্ন করেছিলেন। নইলে খাশনবীশের স্ত্রী সেরে উঠতেন কিনা সন্দেহ। দীপালী ছোট বেলায় পল্টুর সঙ্গে খেলেছে, কিণ্ডার-গার্টেনে একই স্কুলে পড়েছে।

হঠাৎ সুরেন চৌধুরী মারা গেলেন। বিধবা মেয়ে তিনটিকে নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানে স্বামীর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় বড়টির বিয়ে দিয়েছেন। মেজটি মাস্টারী করছে। দীপালী সর্ব-কনিষ্ঠা। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেছে। কলেজে পড়ার খরচ অনেক, তাই নার্সিং কোর্স করছে।

দূরে থেকেও দুই পরিবারের হৃদ্যতার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হয় নি। কলেজ হোস্টেলের একঘেয়ে খাওয়ায় অরুচি ধরে, তাই পল্টু প্রায়ই পটলডাঙা থেকে কালীঘাটে যায় কাকীমার হাতের রান্না খেতে। মাঝে মাঝে দীপালীরা দু'বোন বেড়াতে আসে দিল্লীতে জেঠাইমার বাড়িতে।

দীপালী মেয়েটি লোকের মন কুড়োতে পারে সন্দেহ নেই। অমন যে পরাক্রান্ত খাশনবীশ, নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সব সময়ে যাঁর কাছে ঘেঁষতে চায় না, তাঁকেও সে বশ করতে ছাড়ে নি। যে কদিন দীপালী থাকে, আপিসে যাওয়ার সময় পানের কৌটো, নস্যির শিশি, সাদা ধবধবে রুমাল সবই হাতের কাছে পাওয়া যায়। সে চলে গেলে খাশনবীশেরও মনে হয় বাড়িটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

কিন্তু পরের মেয়েকে স্নেহ করা এক কথা, তাকে পুত্রবধূ করা আর। বিশেষত একে ভিন্ন জাত, তায় নার্স। অসম্ভব।

খাশনবীশের মনোভাব স্ত্রী আগেও অনুমান করেছিলেন। এখন

আর সে সম্পর্কে কোন সংশয় রইল না, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার ছেলে কিন্তু ঐ মেয়েকেই পছন্দ করে রেখেছে।'

এর চেয়ে এটম বা হাইড্রোজেন বোমা ফাটালেই বা ক্ষতি ছিল কি? হিরোশিমার লোকেরা কি এর চেয়ে বেশী অপ্রস্তুত ছিল?

উদ্দীপ্ত ক্রোধ যথাসাধ্য দমন করে খাশনবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করে জানলে? সে তোমায় বলেছে?'

'না, চিঠিতে জানিয়েছে', স্ত্রী জবাব দিলেন।

'কৈ দেখি সে চিঠি,' বললেন খাশনবীশ।

স্ত্রী জানালেন, চিঠিটা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। কথাটা সত্য নয়। চিঠিটা তিনি নিজের আলমারীতে শাড়ীর নীচে লুকিয়ে রেখেছেন। খাশনবীশ সে চিঠির সবখানি পড়বেন, এ তাঁর ইচ্ছা নয়।

খাশনবীশ চিঠির জন্য কোন ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না। স্ত্রীকে বললেন, 'ছেলেকে লিখে দিও, সে এখন বড় হয়েছে, নিজের জামা, জুতো যেমন পছন্দ কিনতে পারে, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তার বেশী বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করিনে।'

সে দিন থেকে খাশনবীশ আপিসে যান, ফাইল করেন, কেরানী চরাণ এবং ঐ দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যবিধির ফাঁকে ফাঁকে সম্ভবপর বৈবাহিকের সন্ধান করেন।

তাঁর স্ত্রী ভাঁড়ার আগলান, রান্নাবান্নার তদারক করেন এবং আড়ালে নীরবে অশ্রুপাত করেন।

ছ'মাসে প্রায় ছ'ডজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে নিজের মনোমতো একটি পাত্রী আধাআধি নির্বাচন করলেন খাশনবীশ। আপিসের সাজ পরতে পরতে স্ত্রীকে বললেন, 'আজ বিকেলে মেয়ে দেখতে যেতে হবে, তুমি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তৈরী হয়ে থেকো।'

স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। খাশনবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'চুপ করে রইলে কেন? আজ কি কোনো অসুবিধা আছে?'

স্ত্রী বললেন, 'মেয়ে দেখতে হয়, একাই দেখ গে। আমি যাব না।'

বিস্মিত খাশনবীশ প্রশ্ন করলেন, 'সে কী কথা? ভদ্রলোককে বলেছি, দুজনেই যাব, এখন—'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই স্ত্রী বলে উঠলেন, 'ছেলে যখন এ মেয়েকে বিয়ে করবে না জানি, তখন মিছেমিছি তাকে দেখতে যাওয়ার বিড়ম্বনা কেন?'

খাশনবীশ বললেন, 'হুঃ, আমি ভেবেছিলুম তার বিদঘুটে মতলব সে ছেড়েছে। দেখছি তা নয়। আমার সম্মতি নেই জেনেও সে ঐ দীপালীকেই বিয়ে করতে চায়? তার সাহস তো কম নয়?'

স্ত্রী বললেন,'সে তো তোমারই ছেলে,জেদ তারই বা কম হবে কেন?'

খাশনবীশ সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, 'সে যেন মনে না ভাবে যে, ছেলে বলেই আমি তার বিলাতী নাটুকেপনা বরদাস্ত করবো। ইনডিসিপ্লীনকে আমি প্রশ্রয় দেব না। আমার কথা মেনে তাকে চলতে হবে, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।'

ফাইল এবং জীবন কোন ক্ষেত্রেই নিজের সিদ্ধান্তের নড়চড় করেন না খাশনবীশ। পিতাপুত্রের সম্পর্কে ঐখানেই ছেদ। বাপ যদি চিঠি লেখা বন্ধ করলেন, ছেলে চলে গেল স্বেচ্ছাবৃত বনবাসে অর্থাৎ চাকুরি নিয়ে আসামের কোন এক চা-বাগানে। সেদিন থেকে শুরু হল দুই তীরে দুই অভিমানক্ষুব্ধ পুরুষের স্বকৃত কৃচ্ছ্রসাধন, মাঝখানে বহমান নিরুপায় জননীর স্নেহকাতর অশ্রুস্রোত।

একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগের বেদনা দুঃসহ। কিন্তু তার ভার রইল শুধু খাশনবীশের মনে। আপিসের কাজে তার এতটুকু প্রকাশ নেই। সেখানে তাঁর মনোযোগ আরও প্রখর, তৎপরতা আরও সুস্পষ্ট।

মাসখানেক পরেই খাশনবীশের বয়স আটান্নর সীমা পার হবে। সরকারী চাকুরির সেটা ডুরাণ্ড বা ম্যাকমোহন লাইন। পার হলেই নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড, অর্থাৎ রিটায়ারমেণ্ট, চলতি বাংলায় যাকে বলা হয় 'পেন্সন'!

খাশনবীশের উদ্বেগের অবধি নেই। নিজের জন্য নয়, আপিসের জন্য। কেরানী ও অন্যান্য অফিসারদের কার কতটুকু দক্ষতা সে তো তাঁর অজানা নয়। তাঁর অবর্তমানে কাজ-কর্মের যে কী অবস্থা হবে, তা ভাবতে গিয়ে তিনি শিউরে ওঠেন। কোন চিঠির জবাবে কি লেখা হবে, কোন ফাইলে কী নোটিং তার বিস্তারিত নির্দেশ লিখে রাখেন পৃথক কাগজে। ভবিষ্যতের জন্য। যে অফিসারটি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন তাঁর পাছে ভুল না হয়, সে জন্য জরুরী কেসগুলির কোনটি কবে সেক্রেটারীর কাছে পেশ করতে হবে তার ফর্দ করে রাখেন একটা খাতায়।

রিটায়ারমেণ্টের দিন আপিসে ঘটা করে বিদায় অভিনন্দন সভা হলো। সেক্রেটারী উচ্ছ্বসিত ভাষায় খাশনবীশের প্রশংসা করলেন; নিজের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এমন নির্ভরযোগ্য সহকর্মী খুব কমই দেখেছেন অকপটে স্বীকার করলেন। শুনে খাশনবীশের চোখে জল আসার উপক্রম। গলায় ফুলের মালা এবং পকেটে নামখোদাই রুপোর সিগারেট কেস উপঢৌকন নিয়ে শেষবারের মতো আপিস থেকে বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই খাশনবীশের মনে পড়ল, আজ আর আপিসে যেতে হবে না। দাড়ি কামাবার তাড়া নেই, স্নান আহার সেরে সাড়ে নটার মধ্যে কোট প্যাণ্টুলান গায়ে চাপাবার প্রয়োজন নেই। আজ আর নীল রং-এর 'ইমিডিয়েট' ও লাল রং-এর 'প্রাইওরিটি' শ্লিপ-আঁটা ফাইল ঘাঁটতে হবে না। 'ড্র্যাফট ফর এ্যাপ্রুভ্যাল' সংশোধন করতে হবে না। প্রাত্যহিক কার্যক্রমের একটানা বন্ধন থেকে আজ পরিপূর্ণ মুক্তি। কিন্তু কৈ, মুক্তির আনন্দ বোধ করছেন না তো!

এতদিন সকাল বেলায় খবরের কাগজটা পড়তে সময় পেতেন না। শুধু হেডলাইনগুলির ওপরে চোখ বুলিয়ে নিতেন। আজ সময়ের অভাব নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নাম, তারিখ থেকে শুরু করে শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশকের নাম, ছাপাখানার ঠিকানা পর্যন্ত প্রতিটি লাইন পড়ে ফেললেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ন'টা তখনও বাজে নি।

বাড়িতে রেডিওটা তিনিই কিনে এনেছিলেন, কিন্তু কোনোদিনই শোনার অবকাশ হয়ে ওঠে নি। আজ নিজেই রেডিওর স্থইচটি খুলে দিলেন। হিন্দী সিনেমার গান আর দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন শুনে বিরক্তি ধরল। বন্ধ করে দিলেন।

ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রাস্তায় আপিসযাত্রীদের সাইকেল অভিযান শুরু হয়েছে দলে দলে। ট্রাফিক আইন বা রোড ম্যানার্সের কোনো ধার ধারে না। রংসাইড করে ডাইনে বাঁয়ে যদৃচ্ছা সাইকেল চালায়। আপিসে যেতে প্রতিদিন খাশনবীশকে এই বেপরোয়া সাইকেল বাহিনীকে বাঁচিয়ে সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে হতো। নিরাপদে অর্থাৎ কাউকে চাপা না দিয়ে আপিসে না পৌঁছানো পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলির ওপরে সে এক নিদারুণ অত্যাচার। আজ আর তার আশঙ্কা নেই।

অয়েল মিনিস্ট্রির মধু সরকার যাচ্ছিলেন। খাশনবীশকে দেখে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে, এখনও তৈরী হও নি দেখছি, আপিসে যেতে হবে না? রিটায়ার করেছ? ও, তাই নাকি? কবে থেকে? তা বেশ, বেশ, এবার প্রাণ ভরে জিরিয়ে নাও; ওয়েল আর্নড রেস্ট। আমাদের তো এখনও বছর চারেক ঘানি টানতে হবে!'

খাশনবীশ মৃদু হাসির চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে নিতান্তই কাষ্ঠহাসি। রাস্তা দিয়ে পরিচিত আরও দু'চারজন গেলেন। তাঁরা হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালেন। প্রতিসম্ভাষণে খাশনবীশও যথারীতি হাত নাড়লেন। কেমন যেন লজ্জিত বোধ করলেন। কাল বিকেল পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাঁদের সগোত্র। একটি রাত্রির অবসানে আজ তিনি একটা পৃথক শ্রেণীতে নেমে এসেছেন। বুকের কোণে খচ করে একটা ব্যথা বাজল।

দূরে স্কুটার-বাহন প্রীতম সিং-এর চেহারা দেখা গেল। মাথায় আসমানী রং-এর পরিপাটি পাগড়িটি। মুখে দাড়ির সযত্ন বিন্যাস। দেখে মনে হয় বুঝি ধোপায় কাচা কাপড়ের মতো মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা। স্যুট, টাই, কলারের বাহার দেখলে তাক্ লাগে। এপাড়ায়ই

থাকে। খাশনবীশের সঙ্গে দেখা হলেই বলে, 'নোবীশবাবু, বেশী খেটে লাভ কি? গভর্নমেণ্টের চাকরিতে গ্রেড বাঁধা মাইনে। কাজে জান দিন কিম্বা ফাঁকি দিন, বছরের শেষে ইনক্রিমেণ্টের হার যে কে সেই। এক পয়সা কম বেশী হবে না।' অপদার্থ কোথাকার। আজ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাক এটা খাশনবীশের ইচ্ছা নয়। মানুষের মৃত্যুর মত সরকারী চাকরিতে রিটায়ারমেণ্টও অবধারিত। তবুও কেন যে প্রীতম সিং-এর কাছে অবসর গ্রহণের কথাটা গোপন রাখার জন্য খাশনবীশ ব্যগ্র হলেন তা তিনি নিজেই জানেন না। তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে সরে গেলেন।

দুপুরে আহারের পর প্রথমে একটা মাসিক পত্রিকা পড়তে চেষ্টা করলেন। মন বসল না! দিবানিদ্রার উদ্যোগ করলেন। টেলীফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠতেই সবার আগে গিয়ে রিসিভার তুললেন। রং নাম্বার।

বেলা পাঁচটার মধ্যে আরও দুটো টেলীফোন এল। দুবারই খাশনবীশ ধরলেন। না, একটাও আপিস থেকে নয়। একবার ভাবলেন নিজেই একটা টেলীফোন করে খবর নিলে কেমন হয়? বহু কষ্টে সে বাসনা দমন করলেন। আশা করলেন, আপিসের শেষে দু'একজন নিশ্চয়ই আসবে দেখা করতে। কেউ এল না। খাশনবীশের হতাশা তাঁর মুখে চোখে গোপন রইল না। দুপুর থেকে রাত দশটায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে সময়টুকু ঘড়ির অঙ্কে ঘণ্টা কয়েক মাত্র। কিন্তু খাশনবীশের কাছে মনে হয় যেন কয়েক যুগ। কি করে কাটাবেন ভেবে পান না।

পাড়ায় সরকারী চাকুরেদের একটা ক্লাব আছে। তার সেক্রেটারী নাছোড়বান্দা লোক। খাশনবীশকেও সদস্য না করে ছাড়ে নি। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে যে কখনও আপিসের টেবিল ছাড়তে পারে না তার পক্ষে শুধু চাঁদা দেওয়াই সার হয়, ক্লাবে যাওয়ার সময় কোথায়? যাক্, এতদিনে বুঝি চাঁদাটার সদ্ব্যবহার হয়। কিন্তু খাশনবীশ সারাটা জীবন শুধু কাজই করছেন। খেলাধূলার খবরও রাখেন নি। পিং পং, ক্যারম

কখনও খেলেন নি। অকশন-ব্রিজ দূরে থাক্, সাধারণ টুয়েন্টিনাইন কিম্বা ব্রে পর্যন্ত জানেন না। ক্লাবে গিয়ে করবেন কী?

সরকারী কর্মচারীদের গল্পগুজব সমস্তই সেক্রেটারায়েট কেন্দ্র করে। কোন সেক্রেটারী প্রাদেশিক গভর্নর বা বিদেশে রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন, কোন জয়েণ্ট সেক্রেটারীর কোথায় প্রমোশন আসন্ন, কোন মিনিস্ট্রিতে কোন মন্ত্রীর প্রীতিভাজনদের জন্য নূতন পদ সৃষ্টি হচ্ছে—তারই আলোচনা। সে আলোচনায় খাশনবীশ এখন শ্রোতামাত্র। তিনি কোনো নূতন তথ্য শোনাতে পারেন না। অস্বস্তি বোধ করেন। মনে হয় তিনি যেন আর পাঁচ জনের সমকক্ষ নন। ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিলেন।

টেলীফোনের মিস্ত্রী এসে খাশনবীশের বাড়ির টেলীফোনটি তুলে নিয়ে গেল। এটা অপ্রত্যাশিত নয়। গভর্নমেণ্ট অফিসারদের বাড়িতে সরকারী কাজের প্রয়োজনে সরকারী খরচে টেলীফোন দেওয়া হয়। অফিসার বদলী হলে বা অবসর নিলে সে টেলীফোন তুলে নিয়ে অন্য অফিসারের বাড়িতে বসানো হয়। সরকারী নিয়ম কানুনে অভিজ্ঞ খাশনবীশের তা অজানা নয়। তবুও কেন যে তিনি আহত বোধ করলেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিগতদিনের পদমর্যাদার সর্বশেষ চিহ্ন ছিল ঐ টেলীফোনটি, আপিসের সঙ্গে তার অন্তিম যোগসূত্র। আজ সেটিও ছিন্ন হওয়াতে বুকের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ফাঁক অনুভব করলেন।

রাত্রিতে শয্যায় শুয়ে চোখে ঘুম এল না। স্ত্রীকে বললেন, 'চল কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসি।'

স্ত্রী তাই চেয়েছিলেন। সোৎসাহে বললেন, 'বেশ তো, চল না কলকাতায়, পরশু নাগাদ বেরিয়ে পড়ি।'

যে কারণে কলকাতার প্রতি স্ত্রীর আকর্ষণ, ঠিক সে কারণেই স্বামীর বিতৃষ্ণা। কলকাতা থেকে আসাম তো কাছেই। শৈলবালার আশা, ছেলেকে দেখতে পাবেন। খাশনবীশের আশঙ্কা, ছেলেকে দেখতে হবে।

অবশেষে মরীয়া হয়ে স্ত্রী বললেন, 'দেখ, দিনকাল বদলেছে, এখন সবাই তোমার মতে চলবে, এমন আশা করো না।'

খাশনবীশ খুশি হলেন না। বিরস কণ্ঠে বললেন, 'ছেলে হয়ে সে বাপকে অগ্রাহ্য করবে আর আমি তাই নিয়ে আনন্দে ধেই ধেই নেচে বেড়াব, এই তুমি চাও?'

স্ত্রী বললেন, 'আনন্দনিরানন্দের কথা নয়, যা ঘটে তাই মানতে হয়। আর অগ্রাহ্য করার কথাই যদি বললে, একবার ভেবে দেখ তো ছেলে যদি ভালোবাসার জোরেই বাপকে না মানে তবে শুধু কর্তৃত্বের চাপ টিকবে ক'দিন?'

সংসারে শৈলবালা কোনদিন কোন বিষয়েই নিজের মতামত প্রকাশ করেন নি, খাশনবীশ যা স্থির করেছেন, নির্বিবাদে তাই মেনে নিয়েছেন। তাই আজ তাঁর এই স্পষ্ট ভাষণে খাশনবীশ বিস্মিত হলেন, স্ত্রীরও যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, সে কথা আজ প্রথম অনুভব করলেন। চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

কলকাতার কথা স্ত্রী আর তুললেন না। দেশভ্রমণে খাশনবীশের কোনোকালেই আগ্রহ নেই। বাকী থাকে শুধু তীর্থপর্যটন। অবশেষে তাই স্থির হল। পঞ্চাশোর্ধে বনে যাওয়া যদি সম্ভব না হয়, তবে অগত্যা বৃন্দাবনেই যাওয়া যাক্।

প্রচলিত গল্পের বিষয়াসক্ত অনিচ্ছুক তীর্থযাত্রীর মতো খাশনবীশ অবশ্য চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লাউ-এর মাচা দেখতে পান নি। তবে একথা ঠিক যে, কোনো তীর্থক্ষেত্রেই খাশনবীশের দু'একদিনের বেশী ভাল লাগল না। তাই বেনারসে শৈলবালার দিদি যখন বোনকে কিছুদিনের জন্য কাছে রাখতে চাইলেন খাশনবীশ আপত্তি করলেন না। সে অবকাশে তিনি একবার দিল্লী ঘুরে আসবেন। পেন্সনের কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

দেখা গেল, শুধু দুরাত্মার নয়, প্রয়োজন হলে সজ্জন ব্যক্তিদেরও ছলের অভাব হয় না,—পেন্সনের কাগজগুলি উপলক্ষ মাত্র, আসল লক্ষ্য অন্যত্র। তাঁর অবর্তমানে আপিসটা কিভাবে চলছে তা জানার কৌতূহল দমন করা খাশনবীশের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

যে-আপিসে খাশনবীশ তাঁর কর্মজীবনের সুদীর্ঘ কুড়িটি বছর

কাটিয়েছেন, ছ'মাস পরে সে আপিসে ঢুকতে গিয়ে আজ যেন একটা বিশেষ উত্তেজনা বোধ করলেন। এ দালানের প্রতিটি কক্ষ, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, এমন কি দেয়ালের প্রতিটি ইটের সঙ্গেও বুঝি খাশনবীশের পরিচয় আছে। তবু প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর নাড়ীর গতি চঞ্চল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হলো। পরীক্ষার হলে প্রবেশের মুখে পরীক্ষার্থীর মনে যে নার্ভাসনেস দেখা দেয়, ঠিক অনুরূপ অনুভূতি।

লিফটের মুখেই গুরুদত্তের সঙ্গে দেখা, নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলেন? কেমন আছেন?'

গুরুদত্ত মানুষটি ভালো, কাজেও চতুর। খাশনবীশ তাকে বরাবরই পছন্দ করতেন। খাশনবীশ খুশি হলেন। কিন্তু সে যে 'স্যার' সম্বোধন করে নি, সেটা খাশনবীশের মনোযোগ এড়াল না। ভাবলেন, ইচ্ছাকৃত নয়।

তাঁর নিজের পুরোনো ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালেন, সাদা জমির ওপরে কালো অক্ষরে 'এস সি খাশনবীশ' লেখা বোর্ডটি নেই। আছে একটি নতুন বোর্ড, তাতে নতুন নাম। বিস্ময়ের কিছুই নেই। তবু খাশনবীশ যেন অবাক হলেন। ঠিক ঐখানে যে মাত্র কয়েক মাস আগে অন্য একটা নামের বোর্ড ছিল, তা বোঝার উপায় নেই তো আজ।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন, ঘরের নূতন মালিক তখনও আসেন নি। খাশনবীশ নিজের হাতঘড়িটির পানে তাকিয়ে দেখলেন দশটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট। তাঁর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হলো। পাংচুয়ালিটির জ্ঞান নেই। অফিসারদের হাজিরা খাতায় সময় লিখতে হয় না বটে, কিন্তু তাঁদের নিজেদের কি সেন্স অব প্রপ্রাইটি থাকবে না? অফিসার নিজেই যদি ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আপিসে না আসেন তবে কেরানীদের দেরী হলে কৈফিয়ৎ চাইবেন কোন মুখে?

খাশনবীশ ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কৈ, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই তো। কেলেণ্ডারটি যেখানে ছিল সেখানেই ঝুলছে। তার ছবিতে তন্বঙ্গী রূপসীর মুখের হাসিটি এতটুকু ম্লান হয় নি। টেবিলে পিতলের কলমদানটি তেমনি উজ্জ্বল, চকচকে। আলমারী, শেলফ, 'ইন ও আউট' লেখা কাঠের ট্রে দুটি সবই যথাস্থানে

আছে। শুধু চেয়ারে এতকাল যে মানুষটি বসতো সে নেই। কিন্তু তার অদর্শনে টেবিলের ওপরে টাইমপীস ঘড়িটি বন্ধ হয় নি, মেঝেতে কার্পেটের রং বিবর্ণ হয় নি। ঘরের কোনোখানে এতটুকু বিষাদের চিহ্ন পড়ে নি। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন খাশনবীশ। নিলাজ কুলটা শুধু ভূমিই নয়, ঘরদোর, আসবাবপত্র সব কিছুই বহুবল্লভা নারীর মতো 'যখন যাহার তখনই তাহার'। হৃদয়হীন, শোকহীন, আনুগত্যহীন।

খাশনবীশ সেক্রেটারীর ঘরের কাছে যেতেই চাপরাসী বাধা দিয়ে বলল, 'সিলিপ দিজিয়ে।'

স্লীপ মানে কার্ড। কার্ড পাঠিয়ে ঢুকতে হবে খাশনবীশকে? অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন চাপরাশীটার পানে। চাপরাশী ছাড়বার পাত্র নয়, কেবলই বলে, বিনা সিলিপে ঢোকার অনুমতি নেই। ভাগ্যক্রমে সেইক্ষণে পুরানো চাপরাশী এসে পড়ল, সেলাম করে বলল, 'এ নতুন লোক, হুজুরকে চেনে না। আপনি ভিতরে যান।' ব্যাপারটা কিছুই নয়, তবু খাশনবীশের মেজাজটা খিঁচড়ে গেল।

ঘরের ভিতরে খাশনবীশের অভ্যর্থনার ত্রুটি হলো না। সেক্রেটারী হাসিমুখে করমর্দন করলেন, স্বাস্থ্যের খবর নিলেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন, অনেক গল্প করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক্ষুনি ঘরে বাজেট সংক্রান্ত জরুরী মিটিং হবে। বাৎসরিক ব্যাপার, খাশনবীশের তো জানাই আছে।

খাশনবীশ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বছরের পর বছর এই বাজেট-মিটিংএ খাশনবীশই ছিলেন ব্যবস্থাপক। মধ্যবিন্দু—সেণ্ট্রাল ফিগার বললেই হয়। বাজেটের খসড়াটা তিনিই করতেন, মিটিংটা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে তা অনুমোদনের জন্য। আজ সেই মিটিং হবে বলে খাশনবীশকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। খাশনবীশের বুকে ব্যথা বাজল। ভাগ্যক্রমে তিনি যখন এ সময়ে এসেই পড়েছিলেন, তখন তাঁকে মিটিংএ যোগ দিতে বললেই বা ক্ষতি ছিল কি? আলোচনায় তিনি যে সহায়তা করতে পারতেন সে কথা কি সেক্রেটারীর জানা নেই?

বারান্দায় বেঞ্চিতে জনচারেক চাপরাশী বসে জটলা করছিল।

খাশনবীশ সমুখ দিয়ে চলে গেলেন, কেউ উঠে দাঁড়াল না। তাঁকে দেখতে পায় নি কি? কে জানে?

হঠাৎ মনে পড়ল, যে প্রয়োজনে এসেছিলেন সেই পেন্সনের কাগজ-পত্রের খোঁজ করা হয় নি তো। ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারীর ঘরে গিয়ে দেখলেন সেখানেও এক নবাগন্তুক। খাশনবীশ নিজের পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক খাতির করে বসালেন, ডিলিং এ্যাসিস্টাণ্টকে ডাকতে পাঠালেন।

কথায় কথায় আপিসে ডিসিপ্লীনের কথা উঠল। খাশনবীশের যেটা সত্ত ক্ষোভের কারণ। নূতন অফিসারটির সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে মনে হল না। শাস্তির ভয় দেখিয়ে নাকি কাজ আদায় করা যায় না। বলে কিনা আপিসে কেরানী, টাইপিস্টদের মনে সেন্স অব পার্টিসিপেশান না জন্মাতে পারলে কর্মদক্ষতা আশা করা বৃথা। যত উদ্ভট মতবাদ! রাবিশ!

ততক্ষণে ডিলিং অ্যাসিস্টাণ্টটি এসে গেল। খাশনবীশের আমলের পুরানো কর্মচারী। খাশনবীশকে যেন চিনতেই পারে না এমন ভাব। বলল, কাগজপত্র লিখে পড়ে তৈরী তো আর আজই হতে পারে না। চার-পাঁচদিন পরে যেন একদিন খোঁজ নেন।

চার-পাঁচদিন? খাশনবীশের সময়ে এ কাজ যে ঘণ্টাতুয়েকের মধ্যে হয়ে যেতো। কেরানীটি অবজ্ঞার হাসি হাসল। ভাবখানা এই যে, সে সময়ের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। আসল কথা, কেরানীটি অতীতে খাশনবীশের কাছে তাড়না খেয়েছে অনেক। এখন তারই শোধ নেবার চেষ্টা। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে প্রায় খাশনবীশকে শুনিয়েই বলল—'হুঃ, এখন আর ডেপুটি সেক্রেটারী নন। থোড়াই কেয়ার করি ওকে। এবার বাছাধনের জুতোর সোল ক্ষয় করিয়ে ছাড়বো।'

আপিসে আরও কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করার বাসনা নিয়ে এসেছিলেন। এখন আর সে ইচ্ছা রইল না। ফিরে চললেন। লছমন চতুর্বেদী খাশনবীশের পুরাতন অনুগত সহকর্মী। দেখতে পেয়ে বলল, 'কি এখনই চললেন? আবার কবে আসছেন? যাবেন কি করে? একটা ট্যাক্সী আনিয়ে দেব কি?'

যথেষ্ট অমায়িক ব্যবহার। কিন্তু খাশনবীশকে আজ বুঝি শুধু খুঁত

ধরার ব্যাধিতে পেয়েছে। তাঁর কেবলই মনে পড়তে লাগল, চতুর্বেদীর তো ড্রাইভার আছে। নিজের গাড়িতেই তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়া তো কঠিন ছিল না। এর আগে যখনই খাশনবীশের গাড়ি বিকল হয়েছে তখনই চতুর্বেদী নিজে যেচে খাশনবীশকে বাড়ি থেকে আপিস এবং আপিস থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেয় নি কি? অভিমানে খাশনবীশের দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, ট্যাক্সীর প্রয়োজন নেই।

ভেবেছিলেন নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সী ধরবেন। সিঁড়ির কাছে এসে বাইরে রোদের দিকে তাকিয়ে সাহস হল না। পাশের দরজায় এক অফিসারের পিওন বসেছিল। তাকে বললেন, একটা ট্যাক্সী ডেকে আনতে। পিওনটি অনেকদিন মিনিস্ট্রিতে আছে। খাশনবীশকে চেনে। বলল, ডিউটি ছেড়ে বাইরে গেলে তার সাহেব বিশেষ গোসা হন। হুজুর যদি মেহেববানী করে অন্য আর কাউকে বলেন।

খাশনবীশের গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলেও তিনি এর চাইতে বেশী আহত হতেন না। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে তাঁর মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। মনে হলো বুঝি বা মুখ থুবড়ে পড়ে যান। তাড়াতাড়ি শক্ত করে রেলিংটা ধরে ফেললেন। ধীরে ধীরে সতর্ক পদক্ষেপে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

এপ্রিলের খর রৌদ্রতাপে পথ জনবিরল। ধূলিকীর্ণ বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে তৃণগুল্ম দগ্ধ, বিশীর্ণ। সমস্ত পৃথিবীটা খাশনবীশের কাছে ঐ তপ্ত পাণ্ডুর আকাশের মতো বিবর্ণ মনে হলো। যে আপিসের কাজে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্যম, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সময় নিঃশেষে দান করেছেন সেখানে আজ তাঁর কিছুমাত্র স্বীকৃতি নেই। একদা যেখানে তিনি ছিলেন অপরিহার্য, আজ সেখানে তিনি অনাবশ্যক। এই নগ্ন সত্য আবিষ্কার করে খাশনবীশ মর্মাহত হলেন। নৈর্ব্যক্তিক সরকারী শাসন-যন্ত্রটাকে একটা বিরাট প্রবঞ্চনা মনে হলো। এতকাল যে প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত ছিল সে কি তবে তাঁর নিজের নয়? শুধু তাঁর চাকরিটার?

মুহূর্তে খাশনবীশের দৃষ্টি থেকে মোহজাল অপসৃত হলো। মন থেকে সকল গর্ব, সকল অভিমান দূর হয়ে গেল। ভূতপূর্ব ডেপুটি সেক্রেটারীর অতি উন্নদ্ধ কল্পলোক থেকে নেমে এলেন ধুলো-কাদার মাটিতে। ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতার বাইরেও যে হাসি-কান্নায় গড়া একটা বৃহত্তর জগৎ আছে, সে তত্ত্ব আজ প্রথম উদ্ঘাটিত হলো খাশনবীশের জীবনে। মনের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ সংহত প্রশান্তি অনুভব করলেন।

পথের এক ক্ষীণদেহ ভিখারী পথচারীদের দয়া উদ্রেকের চেষ্টায় ঢোলক বাজিয়ে তুলসীদাসের ভজন গাইছিল,—শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন ভবভয়হরণম। খাশনবীশ তাকে কাছে ডেকে তার হাতে একটা টাকা দিলেন। সে বেচারী দু'আনা, চার আনার বেশী কখনও প্রত্যাশা করে না। অবাক হয়ে খাশনবীশের মুখের পানে চেয়ে রইল।

সেদিন অনেক রাত্রিতে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে বেনারসে শৈলবালার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁর নামে এক্সপ্রেস টেলীগ্রাম। দেখলেই দুঃসংবাদের আশঙ্কায় বুক কাঁপতে থাকে। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে পড়লেন। পাঁচটি ইংরাজী শব্দে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য—'দীপালীর সঙ্গে পল্টুর বিয়ে স্থির কর।'

স্থান,—পাঞ্জাবের ফজিলপুর। কাল,—উনিশ শ’ বাহান্ন সালের মাঝামাঝি। পাত্র,—সর্দার মেহের সিং। বলে দেওয়া প্রয়োজন, নামধামগুলি সবই কল্পিত। সেটা ইচ্ছাকৃত। কারণ মেহের সিং ও তাঁর স্ত্রীর সত্যিকার পরিচয় ইঙ্গিতেও কারো কাছে প্রকাশ হোক, এ আমার অভিপ্রেত নয়।

মেটকাফ হাউসে ট্রেনিং শেষ করে ছোটো খাটো গোটা দুই তিন কাজের পরে ফজিলপুর আমার প্রথম সাবডিভিশন। ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট রূপে সেখানে হাতে খড়ি।

বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা অল্পতর। ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতায় আই-এ-এস পরীক্ষার ফল দেখে সকল পাত্রীপক্ষ উদ্বিগ্ন তৎপর হয়ে ওঠেন, তাঁদের তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে কৌমার্য তখনও অটুট। সুতরাং স্কুলের ছেলেদের নারী ভূমিকা-বর্জিত নাটকের মতো নিছক পুরুষপরিচালিত সংসার। সেটা পুরোপুরি ভৃত্যতান্ত্রিক। ফৌজদারী বিচার, তাকাভি ঋণ, বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ, হাসপাতাল কমিটির সভাপতিত্ব, মন্ত্রীদের ফরমাস ও এম-এল-এ, এম-এল-সি-দের নালিশ এবং পারমিটের তদ্বির ইত্যাদি প্রাত্যহিক রুটিন কাজের পরেও অবসর যেটুকু থাকে শুধু সে-টুকু আগাথা ক্রিস্টী ও উডহাউস নিয়ে কাটতে চায় না। তাই ফুলের বাগানে মন দিয়েছিলাম।

কাজটা খুব সহজসাধ্য ছিল না। সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারের বাড়িটা ব্রিটিশ আমলের। সেকালের শ্বেতাঙ্গ আই-সি-এস-দের লক্ষ্য করে লী কমিশনের দরাজ সুপারিশের মাপে তৈরী। বিরাট বাংলো, বিস্তৃত চত্বর। একদিকে গ্র্যাভল করা টেনিস কোর্ট, অন্যদিকে বাবুর্চী, খানসামা, মালী, মশালচী নিয়ে এক ব্যাটেলিয়ন অনুচরের বাসের ব্যবস্থা।

এ বাড়িতে আমার পূর্ববর্তী অধিবাসী যিনি ছিলেন, তিনি প্রভিন্সিয়্যাল সার্ভিসের লোক। প্রমোশন পেয়ে সাবডিভিশনের কর্তা হয়ে ছিলেন। তাঁর চাকরি জীবনের সেটা অস্তাচল। গুটিদশেক পুত্রকন্যা নিয়ে বৃহৎ পরিবার। আশ্চর্য নয় যে, ফুলের চাইতে ফুলকপিকে তিনি অনেক বেশী সত্য জ্ঞান করতেন। সমস্ত বাগানটা তিনি ভিণ্ডি, ভুট্টা আর কাকড়িতে ছেয়ে ফেলেছিলেন। কোথাও কোনখানে এতটুকু শোভা বা গন্ধের আভাসমাত্র ছিল না। ফলে পুষ্পচর্চায় আমাকে বাগানটার সমস্তটাই প্রায় ঢেলে সাজতে হল। সে কাজে সর্দার মেহের সিং ছিল আমার প্রধান নির্ভর।

নিরস্ত পাদপ দেশের সঙ্গে পরিচয় নেই। সুতরাং এরণ্ড সত্যি সত্যি কোথাও দ্রুমরূপে গণ্য হয় কিনা জানিনে। কিন্তু মহকুমা শহরে সাবডিভিশন্যাল অফিসারই যে রাজাধিরাজ সে কথা হলপ করে বলতে পারি।

নয়া ম্যাজিস্টার সাবকো ফুলোমে বহুত সখ হ্যায়—এই বার্তা গ্রামে গ্রামে রটি গেল ক্রমে। অধস্তন সরকারী আমলা সেরেস্তাদার থেকে শুরু করে বেসরকারী অর্থীপ্রত্যর্থীর দল সবাই সাহেবের ফুলের বাগানে মদত অর্থাৎ সহায়তা দানের জন্য উদগ্রীব। ভদ্র উপায়ে তাদের আগ্রহ ও উদ্যমকে ঠেকিয়ে রাখাই কঠিন। মেহের সিং কিন্তু নিজে যেচে আসে নি। আমিই ডেকে এনেছিলাম।

খবরটা দিয়েছিল আমার খাস চাপরাশী সুখনলাল। গৃহিণীহীন গৃহস্বামীদের প্রতি চাকর বেয়ারাদের একটা স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব থাকে। গৃহকর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে অপত্নীক গৃহকর্তারা কেবলই খুঁত ধরেন না; ভাঁড়ারের চাবি ও বাজারের হিসাব সম্পর্কে তাঁরা সমান উদাসীন। ফলে প্রভুভৃত্যের মধ্যে একটা সহৃদয় সখ্যতার সৃষ্টি হয়।

বৃদ্ধ সুখনলালের বিশ্বাস জগতে অধিকাংশ লোকই দুর্জন। সুযোগ পেলেই তারা তার তরুণ মনিবটিকে ঠকিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে যাবে। তাই কারণে অকারণে এবং সময়ে অসময়ে সে উপদেশ বিতরণ করে থাকে। শুধু উপদেশ নয়, তথ্যও। বাগিচা সম্পর্কে মেহের সিং যে কত বড়

ওস্তাদ এবং তার গুলাব যে নোমায়েস অর্থাৎ এগজিবিশানে প্রাইজ পেয়েছে সে তথ্য একাধিকবার শোনাতে সে ভোলে নি।

মেহের সিং লোকটা লম্বায় ছ'ফুট। ওজনে বারো স্টোন। কালিদাসের ভাষায় শালপ্রাংশু মহাভূজঃ বললে ক্ষতি নেই। গালে গালপাট্টা, মাথায় পাগড়ি, হাতে লোহার কঙ্কণ। শিখধর্মের চিরপরিচিত পরিচয়চিহ্ন। ঐ চেহারার সঙ্গে আর্মির কর্ণেল, রেলের ঠিকাদার, শহরের ট্যাক্সিচালকের যোগাযোগটা আমাদের মনে প্রায় বদ্ধমূল। সুতরাং মেহের সিং গোলাপের বিশেষজ্ঞ শুনে অবাকই হয়েছিলাম। শরৎ চাটুজ্যে মশাই যাই বলুন না কেন, কাবুলীয়ালার গান গাওয়ার চাইতে সেটা কম বিস্ময়কর নয়।

ফুল সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা যেমন পরিমিত, মেহের সিং-এর জ্ঞান তেমনি গভীর। ক্যাটালগ ঘেঁটে সিনেরেরিয়ার বীজ এনেছিলাম। অথচ ফুল হল না। মেহের সিং বলল, এ ফুল ছায়া চায়, বাংলোর পিছনে যেখানে বেশী রোদ আসে না সেখানে কেয়ারী বানাতে হবে। সাহারানপুরের নার্সারী থেকে অনেক দাম দিয়ে আনা হেলেন-ট্রবল গোলাপ গাছে কুঁড়ি ধরে শুকিয়ে যাচ্ছিল। মেহের সিং এসে রোগ নির্ণয় করল ; ডাইব্যাক হচ্ছে, গাছের ডাল কেটে বাদ দিয়ে তিসির তেলের সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে প্রলেপ লাগাতে হবে। চন্দ্রমল্লিকায় কখন স্টেক বাঁধা চাই, ডালিয়া কি করে ডি-বাডিং হয়, সে বিষয়ে তার অভিমত অভ্রান্ত।

অথচ ফজিলপুরে জনসাধারণের কাছে মেহের সিং-এর প্রসিদ্ধি তার ফুলের জন্যে নয়। আসলে সেটা তার খ্যাতি নয়,—অখ্যাতি। এমন কঠিন কৃপণ কেউ কখনও দেখে নি। চালানী ব্যবসায়ে অঢেল টাকা করেছে, কিন্তু কখনও কাউকে এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেয় না। পাড়ার ছেলেরা ফুটবল ক্লাবের জন্যে চাঁদা চাইতে গিয়ে তাড়া খায়। শহরের বারোয়ারী ধূলণ্ডির জন্য একটা টাকা আদায় করতে কর্মকর্তাদের প্রাণান্ত ঘটে। জনশ্রুতি এই যে, প্রভাতে তার নাম নিলে দিনটায় নানা দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

জানি, পরের অর্থ এবং নিজের আয়ু সম্পর্কে আমাদের সবারই ধারণা কিছুটা অতিরঞ্জিত। কিন্তু মেহের সিং-এর ব্যয়কুণ্ঠতা নিয়ে গল্প বানাবার প্রয়োজন নেই। সে ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা এমনিতেই এত হাস্যকর যে তার ওপরে রং চড়ানো নিতান্তই অনাবশ্যক।

হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশীরা বলে, "সর্দারজী রাজ্যের লোককে ইট, সিমেন্ট লোহা-লক্কড় যোগাচ্ছ। এবার নিজের জন্য পাকা দালান তুলবে কবে ? টাকা তো অনেক কামালে, ভোগ করবে কখন ?"

মেহের সিং হেসে জবাব দেয়, "ঠিক বলেছ তোমরা। আর কটা দিনই বা আছি ? দিনের বেলায় তো ব্যবসা বাণিজ্যের ধান্ধায় বাইরে বাইরেই কাটে, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো শুধু রাত্তিরে। সুতরাং জিন্দেগী যদি আর বিশ সালও হয় তার অর্ধেক মাত্র থাকবো বাড়িতে। ঘুমের মধ্যে ফকিরের চালাঘর যা মোগল বাদশা'র দেওয়ানীখাসও তাই। বাকী থাকে শুধু সকাল আর সন্ধ্যার কয়েকটা ঘণ্টা। সমস্ত যোগ করলে চার, কিংবা বড়জোড় ছ' বছর হবে। তার জন্যে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা রাজমিস্ত্রী আর কণ্ট্রাক্টর ওভারশীয়রের পেটে দেওয়া কেন ?"

এমন গাণিতিক যুক্তির ওপরে তর্ক চলে না। প্রশ্নকর্তারা নিরুত্তর হয়।

মেহের সিং-এর এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ নামজাদা এক সাইকেল কোম্পানীর সেলিং এজেন্সি নিয়েছিল। সে ধনী বন্ধুকে একটা সাইকেল বেচতে উৎসুক। একসঙ্গে সব টাকা চায় না, ইনস্টলমেন্টে অর্থাৎ কিস্তিতে দাম দিলেও চলবে।

প্রস্তাবটা লোভনীয়। কিন্তু পাষাণে তো কর্দম থাকে না। মেহের সিংকে প্রলুব্ধ করা অসম্ভব। সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে বলে, "বাবুয়ানির কম্পিটিশানের কি আর শেষ আছে, ভাই ? আমি সাইকেল কিনেছি তো আড়তদার চিরঞ্জিলাল কিনবে এক্কা অথবা ফিটন। মোটর গাড়ি কিনে আবার তাকেও হয়তো ছাড়িয়ে যাবে কুঠিয়াল কিষণচাঁদ শেঠ। কৈ, কেউ হারাক দেখি আমাকে পায়ে হাঁটার তাগদে ?"

দম্ভটা অনর্থক নয়। চার আনা বাসের ভাড়া বাঁচাতে মেহের সিং

শীতগ্রীষ্ম বারো মাস চার ক্রোশ পথ হেঁটে মণ্ডিতে মাল কিনতে যায়। পদচারণার প্রতিযোগিতায় মেহের সিংকে পরাস্ত করবে, এমন লোকের সংখ্যা বেশী নয়।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার রসবোধ তীক্ষ্ণ! তিনি বোধ হয় কৌতুকচ্ছলেই সর্দারজীর ভাগ্যে এমন এক স্ত্রী জুটিয়েছেন যাঁর হৃদয় দয়ার্দ্র এবং দাক্ষিণ্য অকুণ্ঠিত। হায়, ব্যয়কাতর মেহের সিং-এর অন্তঃপুরেই দানদাতব্যের অবারিত ব্যবস্থা। প্রদীপের নীচেই যেমন অন্ধকার, পুলিশের বড় কর্তার ছেলেই যেমন নক্সালাইট। নিঃস্ব ভিখারী সদরে কর্তার কাছে তাড়না খেয়ে পালাবার পথ পায় না। অন্দরে গিন্নির কাছে পৌঁছুতে পারলে দিনতিনেকের চাল-ডাল ঝুলি ভরে নিয়ে যায়।

বাড়ির যে বৃদ্ধা ঝি শীতে কাতর তার জন্যে কম্বল, রাস্তার যে ঝাড়ুদার ম্যালেরিয়ায় আধমরা তার জন্যে ওষুধ, স্কুলে যে গরীবের ছেলে বই-এর অভাবে পড়তে পায় না তার জন্যে পাঠ্যপুস্তক যোগায় মেহের সিং-এর স্ত্রী।

শাস্ত্রকারেরা বলেন, স্ত্রীচরিত্র মানুষ দূরে থাক দেবতাদেরও বুদ্ধির অগম্য। যদিও স্ত্রীজাতি সম্পর্কে নিজের জ্ঞান খুবই সামান্য, তবুও শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ করিনে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানি, তাতে মনে হয়, সংসারে পুরুষচরিত্রটাও কম দুর্বোধ্য নয়। মেহের সিং-এর ডিক্সেনারীতে সদ্ব্যয় বা অসদ্ব্যয় বলে কোন কথা নেই। ব্যয় মাত্রই তার কাছে অপব্যয়। স্ত্রীর বেহিসেবী পরোপকারবৃত্তি নিয়ে তার মনস্তাপের সীমা নেই। অথচ তাতে বাধা দিতেও সে অনিচ্ছুক।

ফুলের পরেই যে প্রসঙ্গ নিয়ে মেহের সিং বেশী আলোচনা করে, সে তার নিজের স্ত্রীর নির্বিচার দানশীলতা। কোনদিন এসে বলে, আজ হরিয়ানা থেকে এক বিধবা এসে দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে বিবিজীর আনকোরা দু'খানা সালোয়ার হাতিয়ে নিল। অন্যদিন সখেদে জানায় শহরের অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েরা দেয়ালীর মিঠাই খাবে বলে দশ দশটা টাকা নিয়ে গেল।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "সর্দারজী, ওরা দুঃস্থ। তোমার বিবিজী

যদি মাঝে মাঝে তাদের কখনও কিছু দান করেন, তাতে তোমার ঐশ্বর্য ফুরোবে না।"

মেহের সিং অবাক হয়ে বলে, "ফুরোবে না? এ-রেটে চললে কুবেরের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হতে সময় লাগে না, আমি তো কোন ছার। শেষকালে হয়তো আমাকেই পরের দুয়ারে হাত পাততে হবে।"

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, "ভয় নেই, তুমি যা উপায় করছো এবং যা জমিয়েছ তাতে হেসে খেলে তোমাদের জীবন কেটে যাবে, কিছু ভাবতে হবে না।"

মেহের সিং আশ্বস্ত হয় না, বলে, "সাহেব, জমানা বদলে যাচ্ছে। আমাদের জোয়ানীতে দেখেছি টাকায় বারো সের দুধ। এখন এক সেরের দাম এক টাকা; তাতেও পাওভর নলকী পানি!"

প্রতিবাদ নিষ্ফল। বললাম, "তোমার স্ত্রীকে বারণ কর না কেন? যদি না শোনে তার হাতে টাকাকড়ি দিও না।"

মেহের সিং করুণ কণ্ঠে বলে, "না হুজুর, তা হয় না। আমার টাকাকড়ি তো সব তাঁরই। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিয়ে তাঁর মনে কষ্ট দিতে পারবো না।"

আমি যে অবাক হয়েছি সে কথা তার বুঝতে বাকী রইল না। কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গেই বলল, "ছেলেপুলে নেই, একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই তো। তা ছাড়া নসীবের ফেরে এক সময় অনেক তক্‌লিফ সয়েছে, আমি তাঁকে কোন দুঃখ দিতে চাইনে।"

আসল কথাটা বুঝতে কষ্ট হয় না। স্ত্রীকে বেচারা খুবই ভালবাসে। বাস্তবিক স্ত্রৈণ কথাটার মানে জানতে অভিধান খোলার দরকার নেই। মেহের সিংকে দেখাই যথেষ্ট। অর্থে মেহের সিং-এর আসক্তি গভীর। স্ত্রীর প্রতি তার অনুরাগ গভীরতর।

টেস্ট রিলিফের কাজে প্রায় একটানা মাস চারেক গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছিল। সে পালা শেষ হতেই বদলীর হুকুম এল। বাক্স পেটারা বাঁধাছাদার মধ্যে মেহের সিং এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

পাঞ্জাবী ভাষাটা কিছু কিছু রপ্ত হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্যা গাল্ ? খবর কি ?"

সে হেসে জবাব করল, "চাঙগা।"

কিন্তু গলার স্বরে প্রসন্নতার আভাস ছিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে দেখি মুখে চোখে ক্লান্তি ও উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

বাগানের গোলাপের গাছগুলি তুলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এ বাড়িতে আমার অনুগামীর জন্য রেখে যাওয়াও নিরর্থক। সেগুলি মেহের সিংকেই দান করলাম। আমেরিকান পীস্ আর সাসপেন্স গোলাপ দুটো মিহিজামের নার্সারি থেকে অনেক দাম দিয়ে এনেছিলাম ; ফুল আর দেখা হল না।

কিন্তু এসব আলোচনায় মেহের সিং-এর আজ তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ব্যাপার কি ? অসুস্থ ? ব্যবসায়ে গোলযোগ ? সর্দারনী কি আবার কোনো দরিদ্রের কল্যাণে মোটা দান করে বসে আছেন ?

কোনটাই নয়। মেহের সিং বলল, "সাহেব আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

সে কি কথা ? মেহের সিং কৃপণ সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষটা সৎ। সে-কথা সবাই বলে। কণ্ট্রোলের দিনে ব্ল্যাকমার্কেট করে দুপয়সা উপরি কামানো, কারো পাওনা ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি দুষ্ট ব্যবসায়ীদের প্রচলিত অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তার আবার বিপদ কিসের ?

মেহের সিং বললে, "সে অনেক কথা, গোড়া থেকে শুনতে হবে।"

বারান্দায় বেতের চেয়ারগুলি প্যাক হতে তখনও বাকী ছিল। তারই দুটোতে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। শোনা গেল তার কাহিনী।

মেহের সিং-এর বাপ ছিল গ্রামের মধ্যে বর্ধিষ্ণু চাষী। ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। পাড়াগাঁয়ে সারদা আইনের অনুসরণ যত, লঙ্ঘন তার বেশী। বরের বয়স তখন বারো, কনের বয়স ছয়। কিন্তু 'বরাত' অর্থাৎ বরযাত্রীদের সমাদরে কি ত্রুটি ঘটেছিল তা নিয়ে দুই বৈবাহিকে বিয়ের পর দিন থেকেই মন কষাকষি ও কলহ। শেষ কালে মেহের সিং-এর শ্বশুর রাগ করে মেয়েকে জোর করে নিয়ে গেলেন নিজের

বাড়িতে। বরকর্তা বললেন, কুছ্ পরোয়া নেহি। ছেলের আবার বিয়ে দেবেন। কিন্তু সে সংকল্প পূর্ণ হবার আগেই হঠাৎ গেলেন মারা।

বছর না ঘুরতেই পিতৃহীন মেহের সিং-এর কাকারা সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে প্রায় এক বস্ত্রে তাকে পথে বার করে দিল। গ্রামের এক সর্দারজী রেঙ্গুনে ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টের কাজ করতেন। তাঁর দয়া হলো। তিনি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে নিজের ব্যবসায়ে ভর্তি করে দিলেন।

জাপানী বোমার ভয়ে যখন দেশে ফিরে এল মেহের সিং, তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ পার হয়ে গেছে। সে বয়সে বিয়ে করতে গেলে তাদের সমাজে ভালো মেয়ে পাওয়া কঠিন। তাই নিজের পূর্বপরিত্যক্ত স্ত্রীকে এনে সংসার শুরু করল। আত্মীয়পরিজনেরা অবশ্য আপত্তি করেছিল। বিয়ে হয়ে বিশ বছর স্বামীর মুখ দেখে নি যে মেয়ে তার স্বভাবচরিত্র কেমন কে জানে? নানা লোকে যে নানা কথা বলে। তা বলুক। সে-সব কথা গ্রাহ্য করে নি মেহের সিং।

সে জন্য কখনও অনুতাপ করতে হয় নি তাকে। পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে মেহের সিং। সে জন্মে নিশ্চয় তার অনেক সুকৃতি ছিল। নইলে এমন সুশীলা স্ত্রী কোটিতে গুটিক মেলা ভার। বর্মা থেকে আনা সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ছোট কারবার শুরু করেছিল। আজ সে-ব্যবসায়ে হাজার হাজার টাকা খাটছে। এ সমস্তই তার বিবিজীর পয়ে। ঘরকন্নার কাজ, সেবাশুশ্রূষা, এমন কি সেলাই এমব্রয়ডারীতে পর্যন্ত তার জুড়ি মেলে না। তার হাতের রান্না রগৌনজোসের কাছে সাহেবী হোটেলের খানা দাঁড়াতে পারে না। কী আপশোস, হুজুরকে একদিন সে বিবিজীর পাকানো তন্দুরের রুটি, সরষের শাক আর গাজরের হালুয়া খাওয়াতে পারল না।

দুঃখের কখনও কোনো কারণ ঘটে নি এমন কথা অবশ্য মেহের সিং বলতে চায় না। বাল-বাচ্চা হয় নি বলে এক সময় তাদের মন খারাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু ইলাজ অর্থাৎ চিকিৎসার সে কোন ত্রুটি করে নি। আম্বালা, দিল্লী এমন কি বোম্বাইতে যত বড় বড় লেডি ডাক্তার আর

নামকরা স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ আছে তাদের কাউকেই সে দেখাতে বাকী রাখে নি। তা ছাড়া গুরুদোয়ারায় মানত, চিস্তির কবরে সুতো বাঁধা, জলপড়া, মাদুলী, ঝাড়, ফুঁক সবই করেছে। ভগবান দেন নি, কী আর করা যাবে? এ তো মানুষের হাতে নয়।

বিবিজীর খরচের হাতটা দরাজ, সে কথাও অবশ্য না মেনে উপায় নেই। ঘরের টাকাটা পরকে দিলেই যে জমার অঙ্কে ঘাটতি পড়ে সে কথাটা তাকে আজও বোঝান গেল না। কেউ এসে কেঁদে পড়লেই সে গলে যায়। ছোট ছেলেমেয়ের নাম করে কিছু চাইলে তো আর দেবার তর সয় না।

দানধ্যান একেবারে খারাপ এমন কথা অবশ্য মেহের সিং বলে না। পরকালের জন্য কিছু পুণ্য সঞ্চয় নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু তা বলে নিজেদের ভবিষ্যৎটাও তো ভাবতে হবে।

স্ত্রীর পরহিতৈষণা নিয়ে মেহের সিং দুঃখ করে, কিন্তু রাগ করে না। ষোল আনা নিখুঁত পৃথিবীতে কী আছে? মোটামুটি তার সুখেরই জীবন। ব্যবসা, গোলাপ আর স্ত্রী এই তিন নিয়ে বাকী দিনগুলি এভাবে কাটলেই সে খুশি।

কিন্তু হায়, বিধাতা বিরূপ। তার সুখের সংসারে অতর্কিতে ফাটল ধরেছে, ভেঙে খান খান হয়ে যায় বুঝিবা।

মাস কয়েক আগের ঘটনা। হুজুর তখন দৌড়েমে অর্থাৎ টুরে। মেহের সিং দৈনন্দিন কাজকর্মের শেষে বাড়ি গিয়ে দেখে চৌদ্দ-পনর বছরের এক ছোকরা বারান্দায় বসে আছে। জীর্ণ বসন, শীর্ণ শরীর। দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যে সুস্পষ্ট চিহ্নিত।

স্ত্রীর কাছে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গেল। ছোকরার নাম জগজিৎ। সোণিপতের কাছে কোথায় যেন বাড়ি; বাপ, মা, ভাইবোন আপনার বলতে কেউ কোথাও নেই। লুধিয়ানার কোন এক লেদ মেশিনে ঠিকে কাজ করত। ছাঁটাইতে পড়ে এখন বেকার! আহা, বেচারীর ক'দিন খাওয়া জোটে নি।

এ গৃহে এরকম অনাহূত আগন্তুকের আকস্মিক আবির্ভাব অভূতপূর্ব

নয়। স্ত্রীর "আহা"র অর্থও মেহের সিং-এর জানা আছে। পরিপাটি ভোজন, কিছু জামা কাপড় বা নগদ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা হাতে পেয়ে তবেই এধরণের অপ্রার্থিত অতিথিরা বিদায় হয়।

কিন্তু এবার সে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটল। দিন পাঁচ সাত পার হয়ে গেল, জগজিতের নড়বার লক্ষণ নেই। কারণটা স্ত্রীই ব্যাখ্যা করল, "একটা ছোকরা চাকর রাখব কয়েকদিন থেকে ভাবছিলাম। ভালাই হল; জগজিতকে পাওয়া গেল। মাইনে দিতে হবে না, শুধু ছু'বেলা ছু'মুঠো খেতে দেওয়া, ব্যাস।"

স্ত্রীর সুবিধার ব্যাপারে মেহের সিং কোনকালে কথা বলে না। একটা কেন, ছু'টো চাকর রাখলেও বোধ হয় মেহের সিং-এর আপত্তি ছিল না।

অনাহারে পীড়িত লোকের ক্ষুধার প্রকোপটা সাধারণতই বেশী হয়। বিশেষত পরিবেশনে ঔদার্য ঘটলে তার আর মাত্রা থাকে না। ছু'বেলায় প্রায় আধ সের আটা এবং সে অনুপাতে ডাল তরকারী না হলে জগজিতের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। তার চা পেয়ালার বদলে ঘটিতে দিলেই ভালো মানায়। তাতে জলের চাইতে ছুধের অংশ দ্বিগুণ এবং চিনির পরিমাণ পায়েসের।

অপরিণতবয়স্ক বালকের এই ভোজনপটুতা মেহের সিং-এর স্ত্রীর কাছে সত্যিকারের কৌতুকের বিষয়। সে জগজিতের থালায় রুটির সংখ্যা কেবলই বাড়িয়ে দেয়। ফলে জগজিতের আগেকার উপবাসক্লিষ্ট দেহে কিছু দিনের মধ্যেই সবল স্বাস্থ্যের নধর চিক্কণতা দেখা দিল। মেহের সিং-এর স্ত্রীর নতুন কেনা জামাকাপড়ে তাকে এখন রীতিমত ভদ্রসন্তান বলে ভ্রম হতে পারে। কারখানার দিন মজুর বা বাড়ির সামান্য চাকর বলে আর চেনাই যায় না।

আহারে জগজিতের যতখানি মনোযোগ, কাজে তার ততখানিই অবহেলা। মেহের সিং তাকে দোকানের চিঠি বিলি করতে পাঠালে তার অর্ধেক ভুল ঠিকানায় পৌঁছয়। বাজার থেকে জিনিস কিনতে দিলে পয়সা হারিয়ে আসে। ঘরের টেবিলচেয়ার ঝাড়-পোঁছের কাজে

সে তেলের শিশি ভেঙে রাখে। কালির দোয়াত উল্টে দেয়। এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিতে তার বুঝি আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। এক সের গম পিষতে দিন কাবার। এমন অপদার্থকে হাতির খোরাক দিয়ে পোষার অর্থ কী ?

মেহের সিং বলে, "আপদটাকে বিদায় কর দিকিনি।"

স্ত্রী বাধা দিয়ে বলে, "ছেলেমানুষ, এসব কাজ করে নি তো কখনও। দুদিন যেতে দাও, ধীরে ধীরে শিখবে।"

ছেলেমানুষের কিন্তু শেখার কোন গরজ দেখা গেল না। সে অনেক ঘাটের জল খেয়ে মানুষ, বয়স অল্প হলেও সাংসারিক বুদ্ধি তার কিছু কম নয়। মেহের সিং-এর স্ত্রীর দুর্বলতা সে বুঝে নিয়েছে। সে জানে, কাজ না করেও এখানে খেয়ে দেয়ে দিব্যি আরামে দিন কাটানো চলবে।

তা হয়তো চলতো। কিন্তু প্রশ্রয়ের আধিক্যে দিনে দিনে তার সাহস এবং দৌরাত্ম্য দুই-ই বাড়তে লাগল। সে লুকিয়ে মেহের সিং-এর লস্‌সীর গেলাসে চুমুক দেয়। চিরুনীতে টেরী বাগায়। তার পশমের রঙিন গলাবন্ধটা গলায় জড়িয়ে পাড়ার বন্ধুদের কাছে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়।

এসব উপদ্রবে মেহের সিং যতই বিরক্ত হয়, তার স্ত্রী ততই জগজিতের দোষত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করে। মেহের সিং-এর সাধের ছড়িটা কদিন থেকে অদৃশ্য। স্ত্রী বলল, বিড়াল তাড়াতে ভেঙে দুখানা হয়ে গেছে। মেহের সিং রুমাল খুঁজে পায় না। শোনে ধোবী হারিয়েছে। ইদানীং মাঝে মাঝে মেহের সিং-এর পকেট থেকে সিকিটা, আধুলিটা উধাও হয়। স্ত্রীকে জানাতে সে বলে, ফিরিয়ালার কাছে জিনিস কিনেছিল, হাতে খুচরো ছিল না। তাই স্বামীর মনিব্যাগ থেকে দাম দিয়েছে।

কিন্তু হাঁড়িতে সরা ঢাকা দিলেই দগ্ধ মৎস্যের গন্ধ চাপা থাকে না। সেদিন দোকান থেকে ফেরার পথে মেহের সিং স্বচক্ষে দেখতে পেল, জগজিৎ গলির মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট

ঝুঁকছে। তার মনিব্যাগ থেকে অপস্রিয়মাণ টাকাকড়ির গতি যে কী সে সম্পর্কে আর সংশয়ের অবকাশ রইল না।

অথচ জগজিৎকে শাসন করলে স্ত্রীর মুখ ভার হয়, তাকে তাড়াতে গেলে স্ত্রীর চোখ জলে ছলছলিয়ে ওঠে। মেহের সিং কারণ খুঁজে পায় না।

ধনীগৃহে অপুত্রক নারী পুষ্যি নিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার রক্ষা করে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে সন্তানহীনারা কেউ ভাই-এর ছেলে, বোনের মেয়েকে মানুষ করে। কেউ বা পশুপক্ষী,—কুকুর-বেড়াল, টিয়া-কাকাতুয়া পোষে। সে বরং বোঝা যায়। কিন্তু একটা গোত্রপরিচয়হীন পথের ভিখারী নিয়ে বাড়াবাড়ির অর্থ কী? জগজিতের প্রতি স্ত্রীর এই অন্ধ স্নেহাধিক্য মেহের-সিং-এর কাছে একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকা।

স্ত্রীর প্রতি মেহের সিং-এর অসাধারণ প্রেম ও অবিচলিত বিশ্বাস। বর্মা থেকে ফিরে এসে নূতন করে সে শুধু স্ত্রী পায় নি, পেয়েছে নূতন জীবন। সেই শান্ত নিরুপদ্রব প্রীতিসমৃদ্ধ জীবনের মর্মস্থলে পুষ্পকোরকে দুষ্ট কীটের মত প্রবেশ করেছে এই মন্দমতি তস্কর-স্বভাব বালক। সুখের দলগুলিকে সে কেটে ছিন্নভিন্ন করছে। মেহের সিং-এর কাছে জগজিৎ একটা মূর্তিমান বিভীষিকা। তাকে দেখলে ক্রোধ ও বিরক্তিতে তার সর্বাঙ্গে জলবিছুটির জ্বালা ধরে। তার নামটা পর্যন্ত তিক্ত বিষের মতো ঠেকে।

অনেক দুঃখ আছে যা কেবল গোপনেই সইতে হয়, মুখ ফুটে কাউকে বলা চলে না। মেহের সিং আপন মনের অগ্নিদহনে আপনি দগ্ধ হয়।

কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে ; সহ্যেরও আছে শেষ। আঘাত পেয়ে পেয়ে শক্ত পাথরের দেওয়ালও একদিন ধ্বসে পড়ে ধুলায়।

দিন তিনেক আগে বিকালে মেহের সিং দোকানের জাবেদা খাতায় বেচা-কেনার হিসাব মিলিয়ে দেখছিল, এমন সময় মোতিয়ালা গিরিধারীলাল এসে চুপি চুপি বলল, “দেখ তো সর্দারজী, গয়নাটা চিনতে পার কিনা?”

চিনতে কোন অসুবিধা ছিল না। সাবেকী ধরণের ভারী কুন্দনের একটি কণ্ঠি, বারো চৌদ্দ ভরি সোনার কম নয়। বছর তিনেক আগে মেহের সিং নিজেই গড়িয়ে দিয়েছিল স্ত্রীকে।

গিরিধারীলাল বলল, জগজ্জিৎ তা বন্ধক রেখে, তিনশ' টাকা নিয়ে গেছে।

রাগে মেহের সিং-এর সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপতে লাগল, তার নিঃশ্বাস তপ্ত এবং কানের ভিতর থেকে আগুনের হল্‌কা ছুটলো। তক্ষুনি বাড়ি এসে জগজিতের পিঠে কষে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। চুরির দায়ে তাকে অবিলম্বে পুলিসে ধরিয়ে না দিলে তার ক্রোধ শান্ত হবে না। কিন্তু স্ত্রী কেবলই প্রতিবাদ করে। বলে, সে নিজে জগজিতের হাত দিয়ে হারটা দোকানে পাঠিয়েছে। টাকার তার জরুরী প্রয়োজন ছিল।

কথা কাটাকাটিতে প্রয়োজনটা কী এবং কেন তা গোপন রইল না। ফুলেল তেল, গন্ধ সাবান, জরি-বসানো জুতো ইত্যাদি পেয়ে পেয়ে জগজিতের লোভ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। বায়না ধরলেই যদি পাওয়া যায় তবে স্বভাবতই আব্দারের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ইদানীং একটা ট্রানজিস্টার রেডিওর জন্য জগজিৎ মেহের সিং-এর স্ত্রীকে ধরে পড়েছিল।

মেহের সিং স্ত্রীকে প্রচুর অনুযোগ ও কঠোর তিরস্কারে ধিক্কার দিল। ঘর থেকে জগজিতের নতুন কেনা তোরঙ্গসহ জিনিসপত্র টান মেরে বাইরে ফেলে দিল। এ বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি তাকে ফের দেখতে পাওয়া যায় তবে মেরে তার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে বলে শাসাতে লাগল।

সেই দিন থেকে স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ। বলতে বলতে হঠাৎ মেহের সিং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটি চেপে ধরে বলল, "হুজুর, আমাকে আপনি বাঁচান। আমার মান-সম্ভ্রম, টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি সে ক্ষতি সইতে পারবো। কিন্তু আমার স্ত্রী আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সে দুঃখের ভার আমি আর বইতে পারছি নে।"

মানতেই হবে, ব্যাপারটা যেমন দুঃখের তেমনি হতবুদ্ধিকর। কিন্তু এসব হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে বাইরের লোকের কী করার আছে?

মেহের সিং সে-কথা শোনে না। তার বিশ্বাস, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইচ্ছা করলে না পারেন জগতে এমন কিছু নেই। বলে, "সাহেব, আপনি দু'দিন পরে চলে যাবেন। যাবার আগে আমাকে এই মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন।"

আমাকে নিরুত্তর দেখে বলল, "স্যার, ঐ ছোকরাকে এখান থেকে না সরালে আমার সংসার, আমার জীবন ছারখার হয়ে যাবে। এক সময় মনে হয় ওকে আমি নিজ হাতে গলা টিপে মেরে ফেলি, কিংবা তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিই।"

সাংঘাতিক কথা, সন্দেহ নেই। আমার সাধ্যমতো তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব এই আশ্বাস না নিয়ে মেহের সিং গেল না।

দিন দুই তিন ভেবে ভেবে যখন কুলকিনারা পাইনে, তখন হঠাৎ যেন একটা আশার আলো দেখা গেল।

শহরে এয়ার ফোর্সের এক রিক্রুটিং অফিসার ক'দিন থেকে তাঁর ক্যাম্প করেছিলেন। নানা জায়গা থেকে বিমান বাহিনীর জন্য তরুণ ক্যাডেট জোগাড় করা তাঁর কাজ। তাঁকে ডেকে পাঠালাম। সলাপরামর্শের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। সে সব প্রকাশ করাও অনুচিত।

চাপরাশী সুখনলাল একটি জীবন্ত রয়টার। সে বার্তা নিয়ে এল, "হুজুর, জগজিৎ হাওয়াই ফৌজে দাখিল অর্থাৎ ভর্তি হয়েছে। আজ রাত্রির ট্রেনে যোধপুরে ট্রেনিং-এর জন্য রওনা হবে। সেখানে হাওয়াই জাহাজ চালাবে। চার সালের মধ্যে হাজার রূপয়া তনখা পাবে।"

মনোভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা করলাম, "জগজিৎ? সে আবার কে?"

সুখনলাল ব্যাখ্যা করল, "মেহের সিং-এর মুণ্ডে অর্থাৎ ছোকরা চাকর। ভারি শয়তান ছেলে। মেহের সিং-এর বিবিজীকে জরুর যাদু করেছে। নইলে—"

সে আলোচনায় রুচি ছিল না। তাকে নিরস্ত করলাম।

রাত্রি পৌনে বারোটায় যোধপুরের দিকে ট্রেন। যে নাটিকার প্রযোজনায় হাত দিয়েছি তার যবনিকাপতনটা স্বচক্ষে দেখার কৌতূহল হল। ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে জীপে চেপে বসলাম।

ছোট স্টেশান। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুমটা সাধারণতঃ তালাবন্ধই থাকে। আজ সেখানে রিক্রুটিং অফিসার তার সদ্যসংগৃহীত ছাত্র অর্থাৎ রিক্রুটদের নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন। সামনের বারান্দায় একদল বখাটে ছেলে উচ্চ রবে জটলা করছিল। তারা জগজিতের বন্ধু সম্প্রদায়। এতদিন তার পয়সায় ফুর্তি করেছে। অনুমান করি, ব্যথিত চিত্তেই তারা তাকে বিদায় দিতে এসেছে।

শৌখিন জামাকাপড়ের বাহার দেখে জগজিতকে চিনতে বিলম্ব হল না। দিব্যি সযত্নপরিপুষ্ট চেহারা, নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র ঘর থেকে এসেছে এমন কথা মনেই হয় না।

পাছে কেউ চিনতে পারে, এজন্য প্ল্যাটফরমের একধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সুখনলাল এসে চুপি চুপি জানাল "হুজুর, মেহের সিং-এর বিবিজী।"

"বটে ? কোথায় ?"

"ঐ যে ঐখানে" বলে প্ল্যাটফরমের অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

শীতের রাত্রি। হালকা কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তার মধ্য দিয়ে অর্ধ-অস্পষ্ট নারীমূর্তি চোখে পড়ল। আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। সাদা সালোয়ারের উপরে হাঁটু অবধি লম্বিত ডোরা-কাটা কামিজের প্রান্তভাগ হাওয়ায় ঈষৎ তুলছিল। কাঁধের ওপর দিয়ে রঙিন দোপাট্টা ঘোমটার মতো করে মাথায় জড়ানো। সেটা শীতের ভয়ে, কিংবা আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে জানিনে।

বিরক্তি বোধ করলাম। সম্পন্ন ভদ্রঘরের মহিলা ; তার এ কী আচরণ। কোথাকার কোন এক অচেনা অজানা ঘরের ছোকরার জন্য গভীর রাত্রিতে একা এসে স্টেশানে দাঁড়িয়ে থাকতে কি একটু দ্বিধা হল না ? ছিঃ ছিঃ, লজ্জা ভয়ের কিছু কি আর অবশিষ্ট নেই ?

ট্রেন এসে গেল। যাত্রীরা নামল, উঠল। রিক্রুটিং অফিসার রিক্রুটদের নিয়ে একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরা দখল করে বসলেন। ফ্লাইং-অফিসার হয়ে এরোপ্লেন চালনার স্বপ্নে জগজিতের মনে উত্তেজনার অবধি ছিল না। প্ল্যাটফরমের এক প্রান্তে একজোড়া স্নেহকাতর চক্ষের অনিমেষ দৃষ্টি যে আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় ক্ষণে ক্ষণে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে সে কথা সে মূঢ় জানতেও পারল না।

ট্রেন চলে গেল। শেষ মুহূর্তে পাছে জগজিতের মত পরিবর্তন ঘটে, ফজিলপুর থেকে যেতে না চায়, এ আশঙ্কার আর অবকাশ রইল না।

মেহের সিং-এর স্ত্রী তখনও অপস্রিয়মাণ ট্রেনের পিছনে লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে যেতেই প্ল্যাটফরমের অনতিপ্রখর কেরোসিনের আলোতে তার অনাবৃত অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি স্পষ্ট চোখে পড়ল। চমকে উঠলাম। কী আশ্চর্য। এ কী নিখুঁত সাদৃশ্য। নাক, চোখ, চিবুকের গড়ন হুবহু এক। মনে হয় একখানা প্ল্যাস্টার অব প্যারিসে গড়া ছাপ বুঝি দোপাট্টার অর্ধমুক্ত অবগুণ্ঠনে জড়িয়ে আছে।

মুহূর্তে আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধান উদ্ঘাটিত হলো। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালার পর্দা উড়িয়ে নিলে ঘরের ভিতরের দৃশ্য যেমন সহজে দেখা যায়, অজ্ঞাতকুলশীল ভিখারী বালকের জন্য সম্ভ্রান্ত রমণীর দুর্নিবার দুর্বলতার কারণ তেমনি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এবার দুর্ভাগিনীর জন্য সত্যিকারের বেদনা বোধ করলাম। অতৃপ্ত স্নেহ ক্ষুধার সহস্র নাগিনী জাগায়ে জর্জর বক্ষে এই নিরুপায় নারী দিনের পর দিন আপন সমাজ, সংসার, স্বামী ও সম্ভ্রমের জন্য নিজের সঙ্গে কী কঠিন যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। শেষে হৃদয়ের অপ্রতিরোধনীয় শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে নিরুপায় ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে কথা কল্পনা করে করুণা হল।

কিন্তু বিস্ময়ের তো সেখানেই শেষ নয়। মেহের সিং-এর কথা ভেবেও অবাক হতে হয়। তার কি চোখ নেই? লোকটা কি নির্বোধ না বিচারশক্তিহীন? এক মুহূর্তের দেখায় যে তথ্য আমার কাছে ধরা

পড়ল তা এত কাল কি করে তার অগোচরে রইল ? এ শুধু বিস্ময়কর নয়, প্রায় অবিশ্বাস্য।

মেহের সিং-কে আমি পছন্দ করি। ফুলের বাগানে সে নিঃস্বার্থভাবে আমার সহায়তা করেছে। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি তার ভালো হোক। যে মারাত্মক সত্য আজও তার কাছে গোপন রয়েছে, তা যেন কোনদিন তার গোচরে না আসে। ইগনোরেন্স যে ব্লিস, অজ্ঞানতায় যে শান্তি সে কথা এর আগে কখনও এমন প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করি নি।

দিন পনের পরে চার্জ হ্যাণ্ড-ওভার করে ফজিলপুর পরিত্যাগ করলাম। ম্যাজিস্ট্রেটকে বিদায় দিতে স্টেশনে সরকারী বেসরকারী গণ্যমান্য লোকের উপস্থিতি মফঃস্বল শহরের চিরাচরিত প্রথা। যথারীতি নমস্কার, করমর্দন ইত্যাদির পরে বার-লাইব্রেরী, মোক্তার এসোসিয়েশান, নাগরিক সমিতি ইত্যাদির পক্ষ থেকে দেওয়া একরাশ গাঁদা ফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে গাড়িতে উঠলাম। মেহের সিং একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই সে তা নিজের দুই হাতে চেপে ধরে বোধ করি নিঃশব্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করল। "সেলাম, সাহেব, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

আমি অন্য লোকের কান বাঁচিয়ে নিচু গলায় বললাম, "ভগবান তোমারও মঙ্গল করবেন। আপদটা বিদায় হয়েছে, আর ভাবনা নেই।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মেহের সিং জবাব দিল, "জগজিৎ, লৌট আয়া।"

"ফিরে এসেছে ? সে কী ? কবে ?" বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম বললেই হয়।

সে খানিকটা ইতস্তত করে অপরাধের স্বরে বলল, "এই দিন কয়েক হল, আমিই দিল্লী গিয়ে ফৌজী দপ্তরে জেনারেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ছাড়িয়ে এনেছি।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে নির্বাক তার পানে তাকিয়ে রইলাম।

গার্ড হুইসিল বাজিয়ে তার লণ্ঠনের সবুজ আলোটা উঁচিয়ে ধরল।

রাত্রিতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং ভোরে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা একটি মহৎ গুণ। অন্তত শিশুপাঠ্য পুঁথি-পুস্তকে সে কথাই লেখে। আরলি টু বেড অ্যাণ্ড আরলি টু রাইজ মেকস্ এ ম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার পণ্ডিতেরা ক্ষমা করবেন, ও কার্যটি আমার জন্যে নয়।

অনেক দিনের অভ্যাস, সম্পাদকীয় ও নানা কথার গ্যালি প্রুফটা নিজে 'পাস' না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে আপিস থেকে উঠতে পারিনে। ততক্ষণে রাস্তার শেষ ট্রাম ডিপোতে ফিরে যায়, গলির মোড়ে হিন্দুস্থানী পানওয়ালার দোকানে ঝাঁপ বন্ধ হয় এবং পাড়ার অধিকাংশ ফ্ল্যাটে নিশুতির অন্ধকার নেমে আসে।

ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে আহার ও সিগারেট শেষ করে বিছানায় যাওয়ার আগেই ঘড়ির কাঁটা বারোটার নিশানা পার হয়ে যায়, ইংরেজী ক্যালেণ্ডারে তারিখের পরিবর্তন ঘটে।

বলা বাহুল্য, পরদিন সকালে আটটার আগে শয্যা ত্যাগ শুধু কষ্টকর নয়, রীতিমত দুঃসাধ্য। দার্জিলিঙের টাইগার-হিলে এবং পুরীর সমুদ্র তীরে সূর্যোদয় নিশ্চয়ই অতি মনোরম দৃশ্য। কিন্তু সেটা অ্যামেরিকান টুরিস্ট ও কলেজ ম্যাগাজিনের তরুণ কবিদের জন্যই তোলা থাক। তা না দেখার মনোবেদনায় আমি কিছুমাত্র ম্রিয়মাণ নই।

আজও যখন ঘুম ভাঙল, আকাশে মার্তণ্ডদেব তখন যথেষ্ট উঁচুতে। পাশের বাড়ির হেঁসেলে কড়ায় ঘন ঘন খুন্তি আন্দোলনের শব্দ এবং মাঝে মাঝে ঝি চাকরের সরোষ হুঙ্কার। বোঝা যাচ্ছে, কেরানীবাবুদের আপিস অভিযানের সময় অদূরবর্তী।

গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দৈনিক কাগজগুলির পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নি। ময়রা নিজে সন্দেশ খায় না। সেটা সুলক্ষণ। কিন্তু

সম্পাদককে নিজের পত্রিকা পড়তে হয়। শুধু পড়া নয়, আর তিনখান প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে হয়, কোথায় কী ভুল-ত্রুটি ঘটেছে। তারপরেই টেলিফোনে এক প্রস্থ প্রশ্ন, অনুযোগ, নির্দেশ এব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৃদু ভর্ৎসনা বা সতর্কীকরণ। কর্পোরেশানে খবরটা 'নবযুগের' ফ্রন্ট পেজে বেরিয়েছে; আমাদের কাগজে তিনে পাতায় কেন? 'রাষ্ট্রবাণী' শ্রম মন্ত্রীর গুপ্ত চিঠি ফাঁস করেছে; আমাদে স্টাফ রিপোর্টারেরা কি ঘুমুচ্ছে? নিউজ এডিটার, চীফ-সাব, স্পেশা রিপ্রেসেন্টেটিভ কাউকেই রেহাই দিই নে।

কাজটা অপ্রিয় সন্দেহ নেই। অথচ অপরিহার্য। সংবাদপ নির্ভীক হতে পারে, কিন্তু নির্বিকল্প নয়। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানী সিগারেট, সাবান বা তরল আলতার মতো পত্রিকার জগতেও কম্পিটিশা অর্থাৎ প্রতিযোগিতা আছে।

প্রাত্যহিক কর্মসূচীর এই অবধারিত টেলিফোন পর্ব সমাধা ক যখন দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের প্রতীক্ষায় আছি, তখন ভৃত্য এসে ঘোষ করল-—জনে বাবু আসিছন্তি।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তার পানে তাকাতেই কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ক বলল,—সে দারোগাবাবু অছি।

দারোগা? অবাক হলাম। ব্রিটিশ আমলে সম্পাদকের গৃ দারোগা এবং তাঁর সগোত্রীয়দের আগমন একেবারে অপ্রত্যাশিত ছি না। দিনে এবং রাত্রে সময়ে এবং অসময়ে এ বাড়িতেও তাঁদে অতর্কিত আবির্ভাব অনেকবারই ঘটেছে। ঘরের বাক্স-পেঁটরা কাগজ পত্র এমন কি ভাঁড়ারের হাঁড়ি-কলসী পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড করে তন্ন ত অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা, শাসানি মায় চড়টা চাপড়টা কিছুই বাদ যায় নি সশস্ত্র পাহারায় কালো বন্ধ গাড়ি চেপে পর্যায়ক্রমে লর্ড সিংহ রো ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট ও আলিপুর সেন্ট্রাল অথবা প্রেসিডেন্সী জেল—স কিছুরই অভিজ্ঞতা আছে।

কিন্তু কংগ্রেসী আমলে দিনকাল বদলেছে। গভর্নমেন্টকে গা দিলে এখন আর রাজদ্রোহ হয় না; বরং কাগজের জনপ্রিয়তা অর্থ

বিক্রি বাড়ে। সম্পাদকের খ্যাতি বিস্তৃত এবং মালিকের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স পরিপুষ্ট হয়।

তরোয়ালের চাইতে কলমের জোর বেশী এ কথাটা বর্তমান অগণিত শিক্ষিত বেকারের যুগে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পুলিশের চাইতে যে প্রেসের প্রতাপ প্রবল, সে বিষয়ে এখন দ্বিমত নেই।

বেশীক্ষণ অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রইল না। নমস্কার ও প্রতি-নমস্কারের পরে আগন্তুক নিজেই পরিচয় দিলেন। নাম সুধীর বসু। কলকাতা পুলিশের—দারোগা নন, ইনস্পেক্টার। যদিও ইতিপূর্বে আমাদের আলাপ পরিচয় ঘটে নি, তিনি আমারই নিকট প্রতিবেশী। রাস্তার ওপারে লাল বাড়িটায় থাকেন।

বিস্ময়ের কিছু নেই। কথামালার কূপে নিমজ্জিত জ্যোতির্বিদের ন্যায় সাংবাদিকদের দৃষ্টিও সুদূর নভোমণ্ডলে নিবদ্ধ। পায়ের কাছে গুহা গহ্বরের তাঁরা খোঁজ রাখেন না। কাটাঙ্গায় শোম্বে বা টিউনিশিয়ায় বেন খেদার নাড়ীনক্ষত্রের খবর আমাদের নখাগ্রে। পাশের বাড়ির মানুষটিকে চেনা দূরে থাক, তার নামও জানিনে।

উভয় পক্ষে ভদ্রতাসূচক সামান্য দু'একটা মামুলি কথাবার্তার পরে সুধীরবাবু বললেন, "আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এসেছি।"

এবার অবাক না হয়ে উপায় নেই। সম্পাদকের কাছে প্রত্যহই লোক আসে এবং একটু অধিক সংখ্যায়ই আসে। তারা কেউ নিজের বক্তৃতা বা বিবৃতি ছাপাতে চায়, কেউ আনে নানা অভাব-অভিযোগের চিঠি। কেউ বা প্রকাশ করতে চান পাড়ার ক্লাব বা মহিলা সমিতিতে সংগীত অথবা নৃত্যকলায় নিজের অনূঢ়া কন্যার প্রাইজ পাওয়ার বিবরণ ও ফটোগ্রাফ। সম্পাদকের কাছে উপদেশ চাইতে আসাটা অভূতপূর্ব বটে! ব্যাপারটা বিস্তারিত শুনতে হয় তো!

সুধীরবাবু কিছুটা কুণ্ঠার সঙ্গেই বললেন, "ঠিক কী ভাবে যে বিষয়টা আপনাকে বোঝাব ভেবে পাচ্ছিনে। দিন দুই হলো একটি মেয়েকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

সে কী কথা? এতকাল তো জানতাম, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে

সাধারণ মানুষেরাই পুলিসের ফ্যাসাদে পড়ে থাকে। কিন্তু সে-কথা ভদ্রলোককে বলা যায় না। তাই বিস্ময় গোপন করে ঘটনাটা জানতে চাইলাম।

সুধীরবাবু বললেন, "ঘটনাটা বড়ই অদ্ভুত। পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরেছি। দেখি, উঠোনে একটি মেয়ে বসে আছে। চুলগুলি রুক্ষ এলোমেলো, হাত-পা কাঠির মতো, চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকে গেছে। বিশীর্ণ আকৃতি থেকে বয়স সঠিক অনুমান করা শক্ত। তবে সেটা যে পঁচিশের উপরে নয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভাবলাম ভিখারী, অনাহারে অস্থিচর্মসার। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা আধুলি দিতে গেলাম। নিলে না। হঠাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল—"সায়েব আমাকে ফাঁসি দাও।"

বিস্ময়ের বিষয়, মানতেই হবে। গান্ধী যুগে অনেকে স্বেচ্ছায় জেলে যেত বটে। কিন্তু তাঁরা তো বেশীর ভাগই এখন মন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রী। নিদেন পক্ষে এম-পি, এম-এল-এ হয়ে তাঁরা পারমিট ও লাইসেন্সের চেষ্টায় আছেন। আপনি সেধে ফাঁসিতে মরতে চায়, এমন কথা কে কবে শুনেছে? পাগল নয় তো?

সুধীরবাবু নিজেও প্রথমে তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তার অপ্রকৃতিস্থতার কোনো লক্ষণ নেই। আর যাই হোক, মেয়েটা যে উন্মাদ নয়, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোক প্রথমে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে পরে রূঢ় ভাষায় শাসিয়ে মেয়েটিকে তাড়াতে চেষ্টা করেছেন। সে কিছুতেই নড়বে না।

ইনস্পেক্টার-গৃহিণী ছেলেমেয়ে-সহ সম্প্রতি তাঁর পিত্রালয়ে গেছেন। কলকাতার বাড়িতে একটা ঠিকে চাকর ও ইকমিক-কুকার সম্বল করে গৃহকর্তা একা বাস করছেন। তার মধ্যে হঠাৎ এ কী অপ্রত্যাশিত উপদ্রব্য? খালি বাড়িতে বাইরের একটা অজ্ঞাতকুলশীল যুবতী মেয়ে মানুষ দু'দিন দু'রাত্রি কাটিয়েছে, এ খবর যদি একবার গিন্নীর কাণে পৌঁছয়, তবে কুরুক্ষেত্র বাধবে না? তাছাড়া দিনকাল খারাপ। কে কোথা থেকে কখন খবরের কাগজে একখানা উড়ো চিঠি ছেড়ে বসবে

তার ঠিকানা আছে কি? লজ্জায় তখন কাউকে কি আর মুখ দেখানো চলবে? চাই কি, চাকরি নিয়েও হয়তো টানাটানি পড়বে। ভদ্রলোক অত্যন্ত কাতর চক্ষে আমার দিকে তাকালেন।

তার জন্যে সত্যিকার করুণা বোধ করলাম। আশ্বাস দিলাম,—আমাদের কাগজে সে চিঠি ছাপা হবে না। বললাম, "ঘাড় ধরে মেয়েটাকে সদর দরজার বাইরে বার করে দিন। নিজে না পারেন থানা থেকে পুলিস এনে হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আপনি পুলিশ অফিসার: আপনার ভাবনা কিসের?"

সুধীরবাবু বিশেষ আশ্বস্ত হলেন এমন মনে হলো না। তাই লঘু-চপল কণ্ঠে বললাম, "ডাক্তারেরা নিজের চিকিৎসা করেন না শুনেছি; আপনাদের পুলিশেও কি সে-রকম রেয়াজ?"

সুধীরবাবু সে পরিহাসে যোগ না দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "কনেষ্টবল অবশ্য হুকুম করলেই আসে। তারা এসে জোর করে মেয়েটাকে অনায়াসেই দূর করতেও পারে। দরকার হলে, কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি আমাদের চোখের সামনেই চলে। ও সব মাইণ্ড করলে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করা সম্ভব নয়। এ মেয়েটাকেও থানায় টেনে নিয়ে কয়েদ করে রাখতে পারতাম। কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন? কেমন যেন জোর পাচ্ছিনে।"

"কেন বলুন তো? হঠাৎ তার উপরে মায়া বসে গেল না কি?" কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।

সুধীরবাবু জবাব দিলেন, "ঠিক মায়া নয়। বোধ হয় সঙ্কোচ, মানে—একটা যেন হেলপ্‌লেস্‌নেস্।"

ক্ষণেক নীরবতার পরে প্রায় অর্ধস্বগতভাবে বললেন, "চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস নিয়ে আমাদের কারবার। সংসারে স্ত্রী এবং পুরুষ দুই-ই যে কত অধম, কত পাষণ্ড হতে পারে তার দৃষ্টান্ত অহরহই দেখতে পাই। সুতরাং মানুষের কোনো অপরাধেই আমরা চমকে উঠিনে। কিন্তু এ মেয়েটা নিজে থেকেই যে স্বীকারোক্তি করেছে, তা যদি সত্যি হয় তবে সে মনুষ্য সমাজের বাইরে। অথচ তাকে কোনো মতেই স্বভাব পাপী,

মানে আমাদের পুলিশি ভাষায় যাকে বলে হ্যাবিচুয়্যালী ক্রিমিন্যাল, বলা যায় না।"

মনে মনে বিরক্ত হলাম। এ যে কেবলই ভণিতা করে চলেছে। আসল কথাটা কী ?

কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে মনের ভাব সব সময়ে যথাযথ প্রকাশ করা চলে না। সভ্যতার অনেক খেসারৎ আছে; তার মধ্যে এটাও একটা। তাই বিরক্তি গোপন করে যথাসাধ্য লঘু কণ্ঠেই বললাম, "এ তো হলো প্রস্তাবনা। এবার মূল পালাটা শুরু করুন। আমা নিজের অবশ্য আপিস বিকেলে, কোনো তাড়া নেই। কিন্তু আপনাকে যদি এবেলা কাজে যেতে হয়, তবে বেলা বড় কম হয় নি।"

ইনস্পেক্টারবাবু লজ্জিত হলেন। বললেন, "ওঃ, তাই তো! ঘটনাটা সংক্ষেপেই বলছি। আচ্ছা, আপনি তো সাহিত্যিক। বলতে পারেন, জেলাসী কথাটার কোনো বাংলা আছে কি ?"

বললাম, "আছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনা পরে হবে, আগে আপনার রহস্যময়ী মেয়ের কাহিনীটা শোনা যাক।"

তিনি মিনিট দুই চুপ করে কী যেন ভাবলেন, তারপরে প্রশ্ন করলেন, "বিন্ধ্যবাসিনীর কথা মনে আছে আপনার ?"

"কোন বিন্ধ্যবাসিনী ? সেই যাকে উপলক্ষ্য করে শহরে খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে গেল ? মনে আছে বৈ কি।"

ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে যেমন সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি, সামান্য টি-এন-টি কণিকায় যেমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, সে ব্যাপারটার সূচনাও তেমনি অতি সাধারণ ঘটনায়।

একটি শিশুর মৃত্যু সংবাদ। এই আধিব্যাধিপ্রপীড়িত দেশের শত সহস্র অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে নিত্য এমন কত শিশু মরে কে তার খোঁজ রাখে ? কিন্তু এই বিশেষত্বহীন প্রাত্যহিক মৃত্যু তালিকার মধ্য থেকে একটি ঘটনা আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে পত্রিকার প্রথম পাতায় একেবারে ডবল কলাম হেডিং নিয়ে প্রকাশিত হলো। পাঠক মহলে চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

এসেম্বলীতে প্রশ্নোত্তরকালে বিক্ষোভের ঢেউ উঠল। একথা কি সত্য যে, রসুলপুর গ্রামে জনৈক অনাথা বিধবার একমাত্র শিশুপুত্র খাদ্যাভাবে অনাহারে মারা গেছে? উইল দি অনারেবল চীফ মিনিস্টার বি প্লিজড টু স্টেট—?

গভর্নমেণ্ট প্রথমে অস্বীকার করলেন। পরে সাপলিমেণ্টারীর চাপে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, শিশুর বিশেষ কোনো অসুখ ছিল না। বললেন, ডাক্তারের অভিমতে যথোচিত পুষ্টির অভাবে জীবনীশক্তির হ্রাস মৃত্যুর কারণ।

এ রকম হত-ইতি-গজ যুক্তিতে বিরোধী দল শান্ত হয় না। তাঁরা অটপসীর রিপোর্ট দাবি করলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, জনস্বার্থের খাতিরে গভর্নমেণ্ট তা প্রকাশ করতে রাজী নন। ফলে সভাকক্ষে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছল, যখন একজন স্বতন্ত্র সদস্য অভিযোগ করলেন যে, শিশুর মৃত্যুর পরে তার মা বিন্ধ্যবাসিনীও অভাবের তাড়নায় জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। বিরোধী পক্ষের 'শেম' 'শেম' ধিক্কার ধ্বনিতে মন্ত্রীর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

গভর্নমেণ্টের সমর্থকেরা সংখ্যায় ভারি। তাঁরাও তারস্বরে পাল্টা অভিযোগ করতে লাগলেন—একেবারে বাজে কথা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিছক চালবাজি,—পলিটিক্যাল স্টাণ্ট।

স্পীকার শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টায় বৃথাই টেবিলে ঘন ঘন হাতুড়ির শব্দ করলেন—অর্ডার অর্ডার।

কোথায় অর্ডার? ডিসঅর্ডারের আর সীমা পরিসীমা রইল না। দুই পক্ষে প্রবল বাদবিতণ্ডা, সক্রুদ্ধ চীৎকার ও সবেগ মুষ্টি আস্ফালনের মধ্যে বিরোধী পক্ষ এক যোগে ওয়াক-আউট করলেন।

ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ নয়। মনুমেণ্টের তলায় বিরাট জনসভায় বিভিন্ন বক্তা দেশের খাদ্যাভাবের জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় গভর্নমেণ্টকে বিস্তর গালাগাল দিলেন এবং আপিস ভাঙবার মুখে এসেম্বলীর দিকে বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা দ্বারা ট্রাম বাসের রাস্তা আটক করলেন।

"অন্ন দাও বস্ত্র দাও, নইলে গদী ছেড়ে দাও" ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুহুর্মুহু বিদীর্ণ হতে লাগল।

তারপরের অধ্যায় অতি পরিচিত পুরাতন প্যাটার্নেরই পুনরাবৃত্তি। পুলিশ কর্তৃক শোভাযাত্রায় বাধাদান, ইষ্টক বর্ষণ, টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ, রক্তপাত, এম্বুল্যান্স ও হাসপাতাল। পরের দিন হরতাল, ট্রামে অগ্নি-সংযোগ, পাইকারী গ্রেপ্তার এবং গুলীবর্ষণ।

মাত্র মাস দেড়েক আগেকার ঘটনা। তাছাড়া ঐ দক্ষযজ্ঞে নিজেরও কিছুটা অংশ ছিল। একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যথেষ্ট অগ্নি উদ্‌গিরণ করেছিলাম। সুতরাং আনুপূর্বিক সমস্তই স্মরণে ছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে এই অর্ধ-উন্মাদ নারীর সম্পর্ক কোথায়?

সুধীরবাবু বললেন, "সম্পর্ক খুবই নিকট। এ মেয়েটিই বিন্ধ্যবাসিনী।"

"সে কী? বিন্ধ্যবাসিনী তবে মরে নি?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, "না। তার ছেলের অনাহারে মৃত্যুর কথাটাও সত্যি নয়।"

"তার ছেলেও বেঁচে আছে?"

অনুরূপ সহজভাবেই সুধীরবাবু বললেন, "না, ছেলে বেঁচে নেই।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললাম, "মাফ করবেন, মশাই। আমি সহজ বুদ্ধির মানুষ। হেঁয়ালির ধার ধারিনে! বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে মরে নি, আবার বেঁচেও নেই—এ ধরনের ধাঁধায় আমি অভ্যস্ত নই। সোজা বাংলায় যদি বুঝিয়ে বলতে পারেন, শুনতে রাজী আছি। নইলে রেহাই দিন।"

তিনি তাড়াতাড়ি অপ্রতিভভাবে বললেন, "আপনি ভুল বুঝেছেন—মানে, আমিই গুছিয়ে বলতে পারি নি। কথাটা হচ্ছে যে, তার ছেলে অনাহারে মরে নি। কোনো অসুখ-বিসুখেও নয়। তাকে মেরে ফেলেছে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাতেই তিনি নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "হ্যাঁ, সেটা ডেথ নয়, মার্ডার।"

বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই।

"শিশুকে খুন করল কে? কেনই বা খুন করল?" প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু সোজাসুজি জবাব দিলেন না। বললেন, "ব্যাপারটা বিন্ধ্যবাসিনীর নিজের মুখ থেকেই শোনা। এ ছু'দিনে খণ্ড খণ্ড ভাবে জেনেছি। জুড়লে যা দাঁড়ায়, তাই বলছি। গোড়া থেকেই শুনুন।"

খানিক চুপ করে থেকে ঈষৎ হেসে বললেন, "বেশী বকা মেয়েদের স্বভাব। সব বলতে গেলে আমার অনেক সময় লাগবে, আপনারও ধৈর্য থাকবে না। তাই অদরকারী অংশগুলি কেটে ছেটে সংক্ষিপ্ত সারটুকুই বলছি।"—

"বিন্ধ্যবাসিনীর মা দীর্ঘকাল নিঃসন্তান ছিলেন। পূজা-মানত, তাগা-তাবিজ ও নানাবিধ তুকতাক করে যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন বিন্ধ্যবাসিনীর জন্ম। পরিবারে বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বহু বিলম্বিত শিশুদের আদরের পরিমাণটা সাধারণতই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সেটা তাদের ভবিষ্যতের পক্ষে হিতকর নয়।

বিন্ধ্যবাসিনী তার মায়ের বক্ষের ধন, বাবার চক্ষের মণি। সে চোখের আড়াল হলে ছু'জনেই পলকে প্রলয় জ্ঞান করেন। কে জানে, হয়তো এই স্নেহাধিক্যের ফলেই বিন্ধ্যবাসিনী ছোটবেলা থেকে কোপনস্বভাব। যখন তার মুখে ভালো করে কথা ফোটে নি, তখনই সে চটে গেলে নিজের চুল টেনে ছিঁড়ত, গায়ের জামা বা মায়ের আঁচল দাঁতে কাটত। তার ঠাকুমা রগড় করে বলতেন, "এক ফোঁটা মেয়ের তেজ দেখে ভয়ে মরি। বড় হলে এ মেয়ে দেবীচৌধুরাণী না হয়ে যায় না।"

মায়ের চাইতে বাপের প্রতি বিন্ধ্যবাসিনীর টানটা ছিল বেশী। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে অনেকদিন কপট কলহ ঘটেছে।

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, প্রিয়জনের উপর আপন অখণ্ড অধিকার স্থাপনের প্রয়াস নারী-চরিত্রের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। শৈশবেই, বিন্ধ্যবাসিনী বাপের উপরে নিজের দখল সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। প্রতিবেশীদের খোকা খুকুদের কাউকে তিনি কখনও কোলে নেবেন বা একটু আদর

করবেন এমন সাধ্য ছিল না। এমন কি, তার মা স্বামীর সঙ্গে একান্তে হাসি গল্প করলেও তার মুখ ভার ও চোখ ছল ছল হত।

ক্ষুদ্র বালিকার এই প্রবল ঈর্ষাকাতরতা আত্মীয় পরিজনের কাছে কৌতুকের বিষয় ছিল। তার মা অনেক সময় ক্রোধের ভান করে মেয়েকে বলেছেন, "হিংসুটে মেয়ের কাণ্ডখানা দেখ একবার। বলি, ও বাপ-সোহাগী, তোমার বাবার উপর আমারও কিছুটা দাবি আছে যে। সে খবর রাখ কি ?"

স্কুলে বিন্ধ্যবাসিনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল পার্বতী। সে বিন্ধ্যবাসিনীর হোমটাস্কের অঙ্ক কষে দেয়. সেলাই-এর পরীক্ষার জন্য রুমালে ফুল তুলে রাখে। বিন্ধ্যবাসিনীও আমচুরের অর্ধেক বা নারিকেল-তক্তির ভাগ পার্বতীকে না দিয়ে খায় না। তারা এক সঙ্গে বেড়ায়, এক সঙ্গে খেলে, এক সঙ্গে গল্প করতে করতে স্কুলের শেষে বাড়ি ফিরে আসে। অপরিণতবয়স্কা দুই কিশোরীর এত প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পাড়ার বয়স্কা গৃহিণীরা ঠাট্টা করে তাদের নতুন নাম দিয়েছেন—গঙ্গা-যমুনা।

এই নিবিড় সখীত্বের স্বর্গ-সুখে একদিন মূর্তিমতী বিঘ্নের মতো দেখা দিল মালতী। বিন্ধ্যবাসিনীদের ক্লাসে শহর থেকে নবাগতা ছাত্রী। বয়সে সে বিন্ধ্যবাসিনীর চাইতে দু-তিন বছরের বড়ই হবে। তার নিজের রূপ ও বাবার অর্থ দুই-ই সাধারণের চাইতে বেশী। সে ফুলেল তেল মাখে, চিত্রবিচিত্র ফ্রক পরে, কথায় কথায় কলকাতার চিড়িয়াখানা বা মোটর গাড়ির গল্প শুনিয়ে সরলচিত্ত সহপাঠিনীদের তাক লাগিয়ে দেয়। স্কুলের অন্য মেয়েরা তার সঙ্গে ভাব জমাতে ব্যগ্র। শিক্ষয়িত্রী দিদিমণিরাও বুঝি তাকে একটু বেশী খাতির করেন।

সে-দিন স্কুলে পৌঁছুতে বিন্ধ্যবাসিনীর একটু দেরী হয়েছিল। ক্লাশে ঢুকতেই দেখল, মালতী পার্বতীর পাশে বসে আছে। বিন্ধ্যবাসিনী ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে বসেছ কেন ?"

মালতী উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিল, "বসেছি আমার ইচ্ছে। তোমার তাতে কী ?"

বিন্ধ্যবাসিনী দৃঢ়স্বরে বলল, "এটা আমার সীট।"

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। পার্বতী ও বিন্ধ্যবাসিনী বরাবর একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে, সে কথা ক্লাসের সবাই জানে। কিন্তু কনভেনশান তো আছে শুধু দুর্বলের জন্যে, প্রবলেরা চিরকালই তা যদৃচ্ছ লঙ্ঘন করে থাকে। শুধু রাষ্ট্রনীতিতে নয়,—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও। মালতী বিন্ধ্যবাসিনীর সর্বজনস্বীকৃত দাবি হেলায় উপেক্ষা করল। "তোমার সীট মানে? নাম লেখা আছে কোথাও? টাকা দিয়ে কিনে রেখেছ বুঝি?" ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করল সে।

বই, খাতার মতো নাম লেখা না থাকলেই যে ক্লাশে বসার জায়গাটাও অন্য কেউ দাবী করতে পারে, সে কথা বিন্ধ্যবাসিনী কখনও ভাবে নি এবং অর্থ দ্বারা ক্রয় না করলে কোনো জিনিসে কারো নিশ্চিত অধিকার জন্মে কিনা সে সম্পর্কেও তার মনে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন জাগে নি।

সে মালতীর কথার জবাব না দিয়ে আদেশের স্বরে বলল, "এখান থেকে উঠে যাও বলছি, নইলে ভালো হবে না।"

"ইস, হুকুম শোনো মেয়ের! উঠব না তো, দেখি, কী করতে পার?" যুদ্ধের ভঙ্গিতে বলল মালতী।

রাগে বিন্ধ্যবাসিনী টান মেরে মালতীর বইপত্র মাটিতে ফেলে দিল।

মালতী সহজে হঠবার পাত্রী নয়। সে তৎক্ষণাৎ ঠাস করে বিন্ধ্যবাসিনীর গালে এক চড় বসিয়ে দিল।

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন আর স্থান-কাল বোধ রইল না। সে মালতীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমুখের বারান্দা দিয়ে হেডমিস্ট্রেস যাচ্ছিলেন। অন্য মেয়েদের চেঁচামেচিতে ক্লাশে ঢুকে তিনি যুদ্ধরত দুই পক্ষকে থামিয়ে দিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীই আগে বলপ্রয়োগ করেছে। বিচারে তার শাস্তি হল। হুকুম দিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী অন্য বেঞ্চিতে বসবে। মালতী দর্পভরে পার্বতীর পাশে বিন্ধ্যবাসিনীর এতদিনের অবিসংবাদিত আসনে উন্নতশির জয়ধ্বজার মতো সদর্পে বিরাজ করতে লাগল।

তখন বিন্ধ্যবাসিনীর সমস্ত রাগটা পড়ল পার্বতীর উপরে। মালতীকে সে তার পাশে বসতে দিল কেন? কেন সে তাকে বাধা দিল না?

এখনই বা সে ঐ কুচক্রী ডাইনীটার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসে আছে কোন লজ্জায় ? সে উঠে চলে আসতে পারে না বিন্ধ্যবাসিনীর পাশে ? তাকে কি কেউ পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছে ?

ছুটির শেষে বিন্ধ্যবাসিনী পার্বতীর দিকে না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে একা বাড়ি চলে এল। অন্যদিনের মতো বিকেলে পার্বতী যখন তাকে খেলায় ডাকতে এল, বিন্ধ্যবাসিনী তখন মুখ ফিরিয়ে রইল। পার্বতী অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তার প্রসন্নতা লাভ করতে পারল না।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর রোষ দূর হয়ে গেল। বন্ধুকে যে সে অযথা লাঞ্ছনা দিয়েছে, তার সমস্ত অনুনয় অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছে, সে কথা স্মরণ করে বিন্ধ্যবাসিনীর মন খচ খচ করতে লাগল। রাত্রির বাধা না থাকলে বিন্ধ্যবাসিনী সেই দণ্ডে পার্বতীর কাছে গিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে নিতে প্রস্তুত ছিল।

পরদিন সকালে বিন্ধ্যবাসিনী অনেক আগে স্কুলে গেল। তার নতুন নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে পার্বতীর আসার অপেক্ষায় রইল।

ক্লাশের ঘণ্টা বাজবার মিনিট কয়েক মাত্র আগে পার্বতী এল। তার সঙ্গে কে ? বিন্ধ্যবাসিনী চোখে ভুল দেখছে কি ? না, ভুল দেখার জো কোথায় ? এ তো মালতী। তারা দুজনে এক সঙ্গে এসেছে। পার্বতী কোনোদিকে না তাকিয়ে তার নিজের পুরানো স্থানটিতে গিয়ে বসল। মালতী বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি একটা কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গর্বভরে তারই পাশের জায়গাটি দখল করল।

প্রকৃত তথ্য এই যে, পার্বতীও বিন্ধ্যবাসিনীর মন ফিরে পাওয়ার জন্য কম ব্যগ্র ছিল না। সেদিন সে নিজে থেকেই বিন্ধ্যবাসিনীর পাশে গিয়ে বসবে, এই সংকল্প নিয়ে স্কুলে এসেছিল। কিন্তু মালতী যে বিন্ধ্যবাসিনীকে জব্দ করার মতলবে স্কুলের দরজায় তার জন্যে প্রায় ওত পেতে বসে ছিল তা তার জানা ছিল না। মালতী পার্বতীকে গ্রেপ্তার করা আসামীর মতো হাত ধরে ক্লাশে নিয়ে এসে নিজের পাশে বসালো।

পার্বতী মেয়েটি শান্ত নিরীহ ধরনের। প্রভুত্বপরায়ণা বিন্ধ্যবাসিনীর বন্ধুত্বের অনেক অত্যাচার সে নির্বিবাদে মেনে নিত। কোনো কিছু

অপছন্দ করলেও মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে না। সেদিক দিয়ে সে বিন্ধ্যবাসিনীর ঠিক বিপরীত। মালতীর জুলুমে বিরক্ত হলেও তাকে অগ্রাহ্য করার মতো জোর পার্বতীর স্বভাবে ছিল না। বিন্ধ্যবাসিনীর অসন্তুষ্টি কল্পনা করে সে তার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারল না। তাকে না দেখার ভান করে বিরসচিত্তে মালতীর পাশে বসে ক্লাশের পড়া পড়তে লাগল।

ক্লাশের অপর প্রান্তে বসে বিন্ধ্যবাসিনী নিষ্ফল ক্রোধের দুঃসহ আবেগে পীড়িত হতে লাগল। পার্বতী যে নিজে ইচ্ছা করেই মালতীর পাশে বসেছে, সে বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয় রইল না। মালতীর সঙ্গে ভাব করতেই সে ব্যগ্র, বিন্ধ্যবাসিনীকে তার আর কোনো প্রয়োজন নেই এ ভাবনায় তার বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকল। গত রাত্রিতে পার্বতীকে নির্দোষ কল্পনা করে আজ যে এতক্ষণ তার জন্যে সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সে শুধু তার নিজের নির্বুদ্ধিতা। পার্বতীর জন্য বাগান থেকে অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সে পেয়ারা সংগ্রহ করে এনেছিল। সেগুলি সে বরং তার পরম শত্রু অঙ্কের মাস্টারনীকে দিতে রাজী আছে। কিন্তু পার্বতীকে কদাচ নয়।

বাড়ি ফিরে গিয়ে সে তার টিনের বাক্সটিতে সযত্নে সঞ্চিত পার্বতীর দেওয়া পুঁতির মালা, চুলের ক্লিপ, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি উপহার দূর করে ফেলে দিল। রাগে, দুঃখে ও অপমানে তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে নতুন সঙ্গিনী মালতীর সঙ্গে পার্বতীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বিন্ধ্যবাসিনীর মন ফিরে পেতে পার্বতী এখন আর তেমন উৎসুক নয়। বিন্ধ্যবাসিনীর ক্রোধকে পার্বতী ভয় করতো। একবার রাগলে সে যে কোনো সমবয়স্কা মেয়েকে ধরে তার কপালটা দেওয়ালে ঠুকে দিতে পারে, সে অভিজ্ঞতা পার্বতীর ছিল। কিন্তু এবার সে অবাক হয়ে দেখল, বিন্ধ্যবাসিনী ঝগড়া, মারামারি কিছুই করল না ; শুধু কথা বলা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে রইল।

পার্বতী নিশ্চিন্ত হল। মালতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বে আর কোনো

দ্বিধা রইল না। তাকে দোষ দেওয়া চলে না। মালতীর দেওয়ার হাতটা দরাজ, দানের সামগ্রীগুলিও লোভনীয়। নানা রঙের লজেন্স ও নানা স্বাদের চকোলেটের কাছে সামান্য আমসত্ব ও কুলের আচারের আকর্ষণ কতদিন টিকতে পারে? বেচারী বিন্ধ্যবাসিনী।

শুধু কেক, বিস্কুট বা টফির প্রাচুর্যই নয়, মালতীর অন্য উপহারগুলিও যে-কোনো সহপাঠিনীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে সক্ষম। বিন্ধ্যবাসিনী লক্ষ্য করল, পার্বতী নতুন ধরনে চুল বেঁধে এসেছে। কেশ-চর্চার এ ফ্যাশানটা কার অনুকরণ তা বুঝতে বাকী থাকে না। স্কুলের অন্য মেয়েদের মা-মাসিরা জবজবে তেলমাখা চুল কষে টেনে খোঁপা বেঁধে দেয়। নেহাতই যে শৌখীন, সে তারই উপরে বড় জোর একখানা মোষের শিং-এর চিরুনি চড়ায়। মালতীর রকম আলাদা। সে ঘাড়ের কাছে রঙিন ফিতা ফুলের আকারে গেরো দিয়ে চুলগুলিকে সাপের মতো পিছনে ঝুলিয়ে দেয়। তার নাম বুঝি "পনি-টেল।" আহা ছিরি দেখে মরে যাই যেন!

নির্লজ্জ পার্বতীটাও ঐ ঢং নকল করেছে দেখে কদিন থেকেই বিন্ধ্যবাসিনী মনে মনে গর্জাচ্ছিল। আজ তার উপরে চুলে জড়ানো নীল রিবনটা দেখামাত্র বিন্ধ্যবাসিনীর সর্বাঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা ধরে গেল। মাথায় খুন চাপল। সে তড়িৎবেগে সেলাই-এর বাক্স থেকে কাঁচিটা বের করে পার্বতীর দিকে ছুটে গেল। পার্বতী ডেস্কের উপরে ঘাড় হেঁট করে খাতায় নোট লিখছিল। মুখ তুলে তাকাবার অবকাশমাত্র পেল না। বিন্ধ্যবাসিনী নিমেষে তার চুলের মধ্যে ঘ্যাচ ঘ্যাচ শব্দে কাঁচি চালিয়ে দিল। গুচ্ছ গুচ্ছ ঘন কালো চুলের রাশি মেজেতে ছড়িয়ে পড়ল।

পার্বতীর দীর্ঘ চুলের সৌন্দর্য স্কুলে বিখ্যাত ছিল। মুহূর্তের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শোকে পার্বতী ডুকরে কাঁদতে লাগল।

সামান্য একটা সিল্কের সরু রঙিন ফালি কেন যে বিন্ধ্যবাসিনীকে এমন দুর্জয় ক্রোধে আত্মহারা করল, তার ব্যাখ্যা একমাত্র সাইকো-অ্যানালিস্টেরাই জানেন। ইউনিয়ন জ্যাক যেমন ব্রিটিশ অধিকার

বোঝায় বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে ঐ ফিতাটা কি তেমনি পার্বতীর উপরে মালতীর পরিপূর্ণ দখলের ইঙ্গিত বহন করেছে? কে জানে?

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে কান ধরে স্কুল থেকে দূর করে দিলেন। অন্য মেয়েরা সবাই তাকে ছুয়ো দিল। বাড়িতেও তার দণ্ড বিধান কম হলো না। কিন্তু অপরাধিনীকে কিছুমাত্র অনুতপ্ত দেখা গেল না। বরং পার্বতীকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারার আনন্দে সে নিজের সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অনায়াসে অগ্রাহ্য করল। পার্বতীর মাথাটা প্রায় কেশশূন্য হয়ে গেছে। একমাস, দু'মাস, কিংবা তার চাইতেও বেশী, অনেক, অনেক দিন সে আর মালতীর দেওয়া রিবন বাঁধতে পারবে না, একথা কল্পনা করে বিন্ধ্যবাসিনী গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করল।

বিয়ের পর বিন্ধ্যবাসিনী যখন স্বামীর ঘর করতে এল, তখন সে যৌবনে পরিপূর্ণা ষোড়শী। সে বয়সে চপলতা থাকে না; অধিকার-স্পৃহা প্রখর হয়। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীকে সাত পাকে বাঁধল—আক্ষরিক এবং সাঙ্কেতিক উভয় অর্থে। স্বামীর সেবা যত্নে তার ক্লান্তি নেই। যখন যে জিনিসটি চাই হাতের কাছে আগে ভাগে এগিয়ে রাখে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে অর্থসচ্ছলতা পরিমিত। কিন্তু নিপুণ গৃহিণীপনায় বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি থাকতে দেয় না। প্রীতি দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে ছোট খাটো অভাবের ফাঁকগুলিকে সুধায় ভরে দেয়।

স্বামী গোকুল মিশুক প্রকৃতির লোক। গ্রামে সবাই তাকে পছন্দ করে। সবার ঘরেই তার সমান সমাদর। আশ্চর্য এই যে, স্বামীর লোকপ্রিয়তায় বিন্ধ্যবাসিনী খুশি হয় না। কাব্য করে বলা যেতে পারে, গোকুল শুধু স্ত্রীর ভালোবাসার দ্যুতিতে একক চন্দ্রমার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, পাইকারী হৃদ্যতার ভিড়ে অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি তারকার মতো হারিয়ে যাবে না,—বিন্ধ্যবাসিনীর এই অভিলাষ। গদ্যের ভাষায় ফলটা দাঁড়াল এই যে, বধূ বিন্ধ্যবাসিনী ঘরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই গোকুলের দাওয়ায় বহুদিনের পুরানো দৈনন্দিন তাসের আড্ডাটি উঠে গেল। সমবয়সী বন্ধুদের কাছে মনসা-সংক্রান্তিতে—নৌকা-বাইচে

এবং শিবরাত্রিতে গাজনের মেলায় গোকুলের সঙ্গ ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠল।

সেবার বারোয়ারীতলায় গ্রামের ছেলেরা থিয়েটারের আয়োজন করল। তাতে গোকুল অভিমন্যু সাজল। দেখে সবাই ধন্য ধন্য করল। শুধু বিন্ধ্যবাসিনী নীরব রইল। উত্তরা কে সেজেছে তা সে জানে না। কিন্তু ও যে নাকী সুরে 'নাথ' 'নাথ' বলে গোকুলের গায়ে ঢলে পড়ছে সেটা তার কাছে অতিরিক্ত বেহায়াপনা মনে হল। গোকুলেরই বা এত আদিখ্যেতা কেন? এ্যাক্টো করছ, কর। তা' বলে অত 'প্রাণেশ্বরী' বলে চেঁচাবার কি দরকার রে বাপু?

বিন্ধ্যবাসিনী নির্বোধ নয়। সখের দলে ব্যাটা ছেলেরাই পরচুল মাথায় পরে মেয়ের অভিনয় করে, সে কথা সে জানে। অথচ স্বামীর পাশে গোঁফ-দাঁড়ি কামানো মুখে খড়িমাখা উত্তরাকে দেখলেই বিন্ধ্যবাসিনীর মন বিরস হয়। স্বামীর থিয়েটার করায় সে আপত্তি করতে লাগল।

প্রথম অভিনয়ে প্রচুর হাততালির স্বাদ পেয়ে গোকুলের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী নাটকে নায়কের পার্ট করার জন্য তার মন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কিন্তু রিহার্সেলে যাওয়ার সময়টাতে বিন্ধ্যবাসিনী মাথাধরার ভান করে এমন কান্নাকাটি সুরু করে যে, গোকুল বেচারী আর বাড়ির বাইরে যেতে ভরসা পায় না।

গোকুল মানুষটা শান্তিপ্রিয়। ঝগড়া বিবাদকে সে অত্যন্ত ভয় করে। তাই ক্ষুণ্ণচিত্তে সে ধীরে ধীরে খেলাধূলা, বন্ধু-বান্ধব, আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর নিশ্ছিদ্র একাধিপত্যের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল। বিন্ধ্যবাসিনীর বছর দুই সুখেই কাটল।

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, সংসারে কিছুই একটানা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সবই চাকার মতো ঘুরছে। সুখানি চ, দুঃখানি চ। বিন্ধ্যবাসিনী তা জানত কি?

অল্প বয়সেই গোকুলের একমাত্র ছোটবোন সুভদ্রার স্বামী মারা গেল। দু'দিন বাদেই দেওরেরা সুভদ্রার গয়না ও টাকাকড়ি কেড়ে

নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। নিরুপায় বিধবা ভাই-এর সংসারে ফিরে এল।

সুভদ্রা বিন্ধ্যবাসিনীর চাইতে বয়সে অনেক ছোট। অত্যন্ত ভীরু-স্বভাব। ভাই-এর গলগ্রহ হয়েছে বলে তার কুণ্ঠার সীমা নেই। সংসারের সমস্ত কাজের বোঝা সে মাথায় তুলে নিল। রান্না করা, ঘর নিকানো, কাপড় কাচা, মায় গোয়ালে গরুকে জাবনা দেওয়া, ক্ষেতের ধান ঝেড়ে মেপে মরাইতে তোলা সবই নিজে করে। বিন্ধ্যবাসিনীকে কুটোটি নাড়তে দেয় না। এমন মেয়েকে ভালো না বেসে পারা যায় না। বিন্ধ্যবাসিনীর মনে সত্যিকার করুণা হয়। আহা, দুঃখিনীর আর কোথাও ঠাঁই নেই। এক বেলা দু'মুঠো ভাতে ভাত দেওয়া বই তো নয়।

গোকুল স্বভাবতই স্নেহপ্রবণ। বোনকে সে বরাবরই ভালো-বাসতো। তার দুর্ভাগ্যে তার প্রতি স্নেহটা আরও বেড়েছে। সে তার জন্যে মাঝে মাঝে একটু দই, পাটালি বা তিলের বরফি কিনে আনে। কখন কী খেল তার খোঁজ খবর নেয়।

বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে সেটা অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি মনে হয়। ভাবখানা দেখ একবার। সে যেন গোকুলের বোনকে না খাইয়ে রেখেছে। বাস্তবিক বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রার খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট যত্ন নেয়। রাত্রিতে বিধবার ভাত খেতে নেই। বাগানের কলাটা, শশাটা বিন্ধ্যবাসিনী তারই জন্যে তুলে রাখে। একাদশীর দিনে নিজের দুধটুকু জোর করেই সুভদ্রার বাটিতে ঢেলে দেয়। কচি মেয়েটা নির্জলা উপোস দিতে পারে কি ?

বৌঠানকে সুভদ্রা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কখনও সে তাকে আদর করে। স্নেহের স্বরে বলে, "ও সুবি, দু'দণ্ড বসে একটু জিরিয়ে নে দিকিন। মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোকে এখন ঐ চাকি-বেলুন নিয়ে পড়তে হবে না। রুটি ক'খানা আমি নিজেই করে নেবো 'খন।"

আবার তার পর মুহূর্তেই গোকুল যদি তাকে কাছে ডেকে দুটো কথা

বলেছে তো অমনি বিন্ধ্যবাসিনীর অন্য মূর্তি। মুখ ভার করে তিক্তস্বরে বলে, "বসে বসে ভাই-এর সোহাগ কুড়ানো হচ্ছে। ওদিকে উননে দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে, তার হুঁস নেই।" সুভদ্রা অনেক আগেই দুধের কড়া নামিয়ে সরা ঢাকা দিয়ে তুলে রেখেছিল। সেটা কখন আবার কী করে যে উননে উঠল ভেবে পায় না।

তবে এইটুকু বুঝতে বাকী থাকে না যে, দাদার কাছে বেশী ঘেঁষাটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। গোকুল ডাকলেও এখন সে কাজের ছুতো করে তাকে এড়িয়ে চলে।

স্ত্রীর আচরণ গোকুলের কাছেও হতবুদ্ধিকর। বিন্ধ্যবাসিনী দয়ামায়াহীন নয়। গ্রামের দুঃস্থ দরিদ্রদের অনেককেই সে সাধ্যমতো সাহায্য করে, সে তো গোকুল নিজের চোখেই দেখেছে। অনাথা ননদিনীর প্রতি তার বিরূপতার গোকুল কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না।

একই সঙ্গে শ্যাম এবং কুল বজায় রাখা কঠিন কাজ, সেকথা গোকুল শুনেছে। বউ ও বোনকে একই বাড়িতে রাখা তার কাছে কঠিনতর মনে হল। অবশেষে বোনকে আবার তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসাই স্থির করল।

সেদিন সকালেই তাকে কেন্দ্র করে স্বামীস্ত্রীতে এক পালা কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তাই যাওয়ার আগে সুভদ্রা যখন বৌঠানকে প্রণাম করতে গেল, বিন্ধ্যবাসিনী মুখ গম্ভীর করে রইল। কিন্তু সে যখন তার শাড়ি দু'খানা, জল খাওয়ার পাথরের ছোট ঘটিটি, একখানা রাধাকৃষ্ণের পট ও অনুরূপ দু'একটা অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তির সামান্য পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে গেল, বিন্ধ্যবাসিনীর বুকে ব্যথা বাজল।

বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রাকে একটি ছোট টিনের বাক্স দিয়েছিল। তার পরিত্যক্ত ঘরটিতে গিয়ে দেখল সেটি কুলুঙ্গির উপরে ঠিক তেমনি রয়েছে। বিন্ধ্যবাসিনী বাক্সের ডালাটি তুলে দেখল, গুটি দুই সূতী জামা, কাঠের ফ্রেমে আঁটা ছোট একটি আরসি, একটি পশমের জীর্ণ আলোয়ান এবং

একটি ছোট কৌটায় কয়েক আনা ও পয়সা মিলিয়ে দু'টাকার কাছাকাছি অর্থ পড়ে আছে। জিনিসগুলি বিন্ধ্যবাসিনীরই নানা সময়ের দান। সুভদ্রা কিছুই নিয়ে যায় নি, ফেলে রেখে গেছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর অশ্রু আর বাধা মানল না। অকারণ বৈরিতায় যে নিরাশ্রয় বিধবাকে সে এ-বাড়িতে তিষ্ঠতে দেয় নি তারই বিচ্ছেদ বেদনায় মেজেতে বসে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আগুনের মতো অসুবিধাজনক খবরগুলিও কিছুতেই চাপা থাকে না। শারদীয় পূজা আসন্ন। বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রার জন্য একজোড়া থান, কিছুটা আখের গুড়, নিজের গাছের গুটি কয়েক পেঁপে ও পাঁচটি টাকা গুছিয়ে রেখেছিল। দত্তদের বাড়ির একটি ছেলের হাতে পাঠাবে। সেখানেই কথাটা শুনে এল। সুভদ্রার হৃদয়হীন দেওরেরা হঠাৎ কেন যে বিধবা ভ্রাতৃবধূকে আবার বাড়িতে স্থান দিতে রাজী হয়েছে সে উদারতার রহস্য এতদিনে উদ্‌ঘাটিত হল। স্ত্রীকে লুকিয়ে গোকুল তাদের হাতে নগদ একশ টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছে।

গোকুল গোড়াতে প্রতিবাদ করল। শেষটায় বলল, একশ' নয়; নব্বুই। জানাল, টাকাটা সুভদ্রার স্বামীর। মৃত্যুর আগে গোকুলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

জগতে স্বামী মাত্রেই জানেন যে, স্ত্রীর কাছে সময় বিশেষে দু'একটা মিথ্যা কথা না বলে সংসারে বাস করা দুরূহ। কিন্তু ধরা পড়লে যে আর রক্ষা থাকে না, সে-কথাও তাঁদের অবিদিত নেই। গোকুল যে মহাজনের কাছে জমি জমা বন্ধক রেখে চড়া সুদে ধার করেছিল সে গুপ্ত খবরটুকু বিন্ধ্যবাসিনীর অগোচর ছিল না। সে দু'চক্ষে ঘৃণা বর্ষণ করে স্বামীকে মিথ্যাবাদী বলে গাল দিল।

গোকুলের মনে অনেক দিনের বিক্ষোভ জমা ছিল। নদীর মতো সহিষ্ণুতার বাঁধ একবার ভাঙলে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত। সে উদ্ধত কণ্ঠে বলল, "আমার জমি আমি বাঁধা দিয়েছি। বেশ করেছি।"

স্বামীর এমন প্রকাশ্য বিদ্রোহ বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রাগে তার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। প্রায়

চীৎকার করে বলল, "জমি তোমার? তুমি ইচ্ছামতো তছনছ করবে ভেবেছ? শেষে আমার ছেলের হাত ধরে আমি পথে পথে ভিক্ষা করে খাই—এই তোমার মনের বাসনা? বেশ তো। তোমার আদরের বোনকে নিয়ে এসে ঘর সংসার চালাও। আমি যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।"

গোকুলেরও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে আরও বেশী চেঁচিয়ে বলল, "তুমি যাবে কেন? আমিই চলে যাচ্ছি। এ অশান্তির পুরীতে আর এক মুহূর্ত নয়।" দড়ির আলনায় হাতের কাছে যে জামাটা ঝুলছিল তাই টেনে নিয়ে গোকুল ঝড়ের বেগে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভেবেছিল, স্বামী বড় জোর দু'চার দিন বন্ধুবান্ধবের বাড়ি কাটিয়ে রাগ পড়লে আপনি ঘরে ফিরে আসবে। দিনের পর মাস কেটে গেল। মাসের পর বছর। গোকুল ফিরল না।

কেউ বলল, সে অঘোর অধিকারীর যাত্রাদলে নলরাজার পার্ট করছে। কেউ বলল, সে শহরের চটকলে দিন মজুরী খাটছে। কেউবা বলল, সে বাবুগঞ্জের হাটে মুগ-মুসুরের কিস্তি নিয়ে যাচ্ছিল, নৌকা-ডুবিতে মারা গেছে।

স্বামী বিরহিতা বিন্ধ্যবাসিনীরও দিন কাটে। সঙ্গহীন, শান্তিহীন জীবন যখন দুর্বিষহ মনে হয়, একমাত্র শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে অশ্রু মোচন করে।

পৃথিবীতে শোকের যদি বা শেষ আছে, দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বর্ষার শেষে গ্রামে ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগেছিল। বিন্ধ্যবাসিনীও শয্যা নিল।

হঠাৎ একদিন ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই চোখ চেয়ে বিন্ধবাসিনী দেখল, সুভদ্রা। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিচ্ছে। সে বিন্ধ্যবাসিনীর অসুখের খবর পেয়েছিল কিংবা শ্বশুরবাড়ি অসহ্য হওয়াতে পালিয়ে এসেছে তা সে-ই জানে।

বিন্ধ্যবাসিনী সজল চক্ষে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার অসন্তোষের ভয়েই সুভদ্রাকে একদিন চলে যেতে হয়েছিল, সে

অনুশোচনায় বিন্ধ্যবাসিনীর হৃদয় ভারাক্রান্ত। তার জন্যেই ভাই নিরুদ্দেশ এ ভাবনায় সুভদ্রার মন অপরাধী। অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে দুই অনুতপ্তা নারীর পুনর্মিলন ঘটল।

সুভদ্রা ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়ায়, সাবু জ্বাল দিয়ে পথ্য তৈরী করে; রাত জেগে বিন্ধ্যবাসিনীর শিয়রে বসে হাওয়া করে বা সোরাই-এর ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জ্বরতপ্ত কপাল মুছে দেয়।

মায়ের চেয়ে ছেলের পরিচর্যাটা সর্বক্ষণের। দুরন্ত শিশুর আব্দার অসংখ্য। তাকে সামলাতেই সুভদ্রার দিনের বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়।

দুর্ভাগারা চিরকালই দীর্ঘজীবী। তা নইলে দুঃখ কষ্ট সইবে কে? হতভাগিনী বিন্ধ্যবাসিনীও ছ' সাত মাস যমে মানুষে টানা-টানির পরে সেরে উঠল। সুভদ্রার চিবুক ধরে বিন্ধ্যবাসিনী সস্নেহ কণ্ঠে বলল, "খোকনকে আজ আমার বিছানায়ই শুইয়ে দিস। ও যে তোকে রাত্তিরেও ঘুমুতে দেয় না।"

খোকনের সে-প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি দেখা গেল। সে তার ঝাঁকড়া চুলভরা ছোট মাথাটি নেড়ে জানিয়ে দিল, "পিসির কাছে ঘুমুবো।"

শুনে বিন্ধ্যবাসিনী ও সুভদ্রা দু'জনেই হাসল।

হায়, হাসিটা বেশী দিন স্থায়ী হলো না।

মায়ের চাইতে মাসির দরদটা চিরকালই হাস্যকর। দেখা গেল পিসির প্রতি বেশী অনুরাগটাও গৃহে শান্তিরক্ষার অনুকূল নয়। বিন্ধ্যবাসিনীর পুত্রগত প্রাণ। এতদিন অসুখে নিজের শক্তি ছিল না; তাকে দূরে রাখতে হয়েছে। এখন একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই ছেলেকে সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখতে ব্যাকুল হল।

বিন্ধ্যবাসিনীর স্নেহ অধিক; ধৈর্য পরিমিত। সুভদ্রা শিশুর সমস্ত দৌরাত্ম্য হাসিমুখে সহ্য করে। আশ্চর্য নয় যে, মায়ের চাইতে পিসির সঙ্গে তার ভাব বেশী। সেটা বিন্ধ্যবাসিনীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়।

বিন্ধ্যবাসিনী ছেলেকে খাওয়াতে বসেছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে দু' গ্রাস গেলাতে পারল না। শিশু খাবার ছড়িয়ে, ফেলে

একাকার করল। বিন্ধ্যবাসিনী ক্লান্ত হয়ে হার মানল। সুভদ্রা এসে কাক দেখিয়ে, চিল দেখিয়ে, টুনটুনির গল্প বলে অনায়াসে খাইয়ে দিল। বিন্ধ্যবাসিনী ছেলেকে স্নান করাতে গেলে সে ছুটে পালায়, ঘুম পাড়াতে গেলে দস্যিপনা শুরু করে। সুভদ্রার হাতে সেগুলি নিরুপদ্রবে নিষ্পন্ন হয়।

দিনে দিনে বিন্ধ্যবাসিনীর মন তিক্ততায় ছেয়ে যায়। সুভদ্রা দেখে, বিন্ধ্যবাসিনী আজকাল অকারণে রেগে যায়, অনর্থক বকুনি দেয়, খামকা গুম হয়ে বসে থাকে। বৌঠানের এ চেহারার সঙ্গে অতীতে তার নিষ্ঠুর পরিচয় ঘটেছিল। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কাঁপতে থাকে।

শঙ্কাটা উভয়তঃ। বিন্ধ্যবাসিনীর মনে পড়ল, সুভদ্রাই তার জীবনের দুষ্টগ্রহ, ভাগ্যাকাশে শনি। সে যতদিন আসে নি গোকুলের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিরোধ ছিল না। তারই জন্য সে স্বামী খুইয়েছে। তার জন্য কি বিন্ধ্যবাসিনীর শেষ অবলম্বন ছেলেকেও হারাতে হবে? ভাবতেই বিন্ধ্যবাসিনী শিউরে উঠল।

পুরানো শাড়ীর পাড় থেকে সুতো খুলে খুলে সুভদ্রা নিজের ঘরে কাঁথা সেলাই করছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে পাশে বসে খেলছে। হঠাৎ তার কী খেয়াল হল। বায়না ধরল বেড়াতে যাবে। শিশুকে ভোলাতে তার কথায় সায় দিতে হয়। সুভদ্রা বলল, "যাবে বৈ কি। মা এখন ঘুমুচ্ছে। মা ঘুম থেকে উঠলে আমরা সবাই বেড়াতে যাব। খোকন যাবে, মা যাবে, আমি যাব।"

খোকন বাধা দিয়ে বলল, "মা যাবে না।"

সুভদ্রা বলল, "মা না গেলে, খোকনকে কোলে নেবে কে?"

সে-টা খোকনের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। সে প্রশ্নের জবাবও তাকে ভাবতে হয় না। সে নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল, "তুমি কোলে নেবে।"

সুভদ্রা বলল, "বেশ, আমিই খোকনকে কোলে নেব। কিন্তু মাকে সঙ্গে না নিলে মা কাঁদবে যে।"

জননীর ক্রন্দন সম্ভাবনায় শিশুপুত্রকে কিছুমাত্র বিচলিত দেখা গেল

না। সে তার পূর্ব সংকল্পে অটল রইল। বলল, "না, মা যাবে না। মা আমাকে মেরেছে।"

কথাটা অতিরঞ্জিত। সকাল বেলা সে মায়ের ওষুধের শিশিটা নিয়ে খেলা করছিল। মা দেখতে পেয়ে তা হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল মাত্র। শিশুর মন থেকে সে ক্ষোভ দূর হয় নি।

সুভদ্রা বলল, "ওমা, তাই নাকি। তবে তো মাকে কিছুতেই সঙ্গে নেওয়া হবে না। মাকে খুব বকে দিতে হবে। মা বড্ড মন্দ, বড্ড দুষ্টু।"

বিন্ধ্যবাসিনী দোরের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্তই শুনছিল। শেষ কথাটা কানে যেতেই একেবারে যেন ক্ষেপে গেল। মা মন্দ, মা দুষ্টু! এ সব জপিয়েই যে সুভদ্রা ছেলেকে তার কাছে পর করে দিচ্ছে সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ রইল না। সুভদ্রার সেবা, যত্ন, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সমস্তই একটা বিরাট ছলনা মনে হল। বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলের উপরেই সুভদ্রার লোভ। তাকে কেড়ে নেওয়ার জন্যেই মায়াবিনী তার স্নেহের মায়াজাল পেতেছে। নইলে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সে আবার এখানে আসবে কেন? বিন্ধ্যবাসিনী বোকা, তাই এতদিন বুঝতে পারে নি। সে প্রতিজ্ঞা করল, রাক্ষসীকে আর এক দণ্ড এখানে থাকতে দেওয়া নয়।

হতচকিত সুভদ্রা বুঝতে পারল না, কোথায় কখন তার কী অপরাধ ঘটেছে। সে কাঁদতে লাগল। মেয়েদের চোখে জল দেখলে পুরুষের হৃদয় গলে যায়; স্ত্রীলোকের মন আরও শক্ত হয়ে ওঠে। সুভদ্রার অশ্রুকাতর প্রার্থনায় বিন্ধ্যবাসিনী কিছুমাত্র নরম হল না। তাকে বাড়ি থেকে দূর করে না দিয়ে সে থামল না।

আপদ গেল। কিন্তু বিপদ কাটল না। মুশকিল বাধালো বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে। কিছু না বুঝেও সে এটুকু বুঝতে পারল যে, মা পিসিকে বকেছে। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা তাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। শ্রান্ত বিন্ধ্যবাসিনী অভুক্ত শিশুকেই ঘুম পাড়াবার উদ্যোগ করল। বিছানায় শুয়ে ছেলে পিসির কাছে যাওয়ার জন্য কান্না জুড়ে দিল।

বিন্ধ্যবাসিনী তাকে কী উপায়ে শান্ত করবে ভেবে পায় না। কোলে নিয়ে ঘুম-পাড়ানি ছড়া শোনাল, বৈয়ম থেকে মিছরির খণ্ড হাতে দিল, কাঠের ঘোড়া, টিনের ঝুমঝুমি যেখানে যত খেলনা ছিল সব জড়ো করল। সমস্তই বৃথা। পিসি তার জন্য মুড়কি কিনতে গেছে, এক্ষুনি আসবে ইত্যাদি স্তোক বাক্যেও ক্রন্দনরত শিশুকে ভোলান গেল না।

বিন্ধ্যবাসিনীর শরীর দীর্ঘ অসুস্থতার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠে নি। মানসিক উত্তেজনা ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অবসাদে দুর্বল দেহ আরও অবসন্ন হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় চিত্ত প্রসন্ন ও মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা সহজসাধ্য নয়। সে বিরক্ত হয়ে কড়া স্বরে বলল, "চুপ কর বলছি, নইলে মার খাবে।"

তোষণ এবং শাসন উভয় পন্থাই বিফল। ছেলের কান্না থামে না।

ধৈর্যচ্যুত বিন্ধ্যবাসিনী ছেলের পিঠে নিজের হাতের দু' এক ঘা বসিয়ে না দিয়ে থাকতে পারল না।

শিশু আরও উচ্চ স্বরে 'পিসি' 'পিসি' ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বিন্ধ্যবাসিনীর দুই কানে কে যেন গরম লোহার পেরেক বেঁধাতে লাগল। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শাসাল, "ফের পিসির নাম নিয়েছ কি মেরে খুন করব। চুপ, চুপ।" হাত দিয়ে সে ছেলের মুখ চেপে ধরল।

বাপরে। ঐটুকু শিশুর গায়ে যেন অসুরের জোর এসেছে। ক্ষীণ স্বাস্থ্য বিন্ধ্যবাসিনী তাকে এঁটে উঠতে পারল না। মায়ের হাতটা সজোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে চীৎকার করল,—পিসি।

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। "তবে রে, তোমার গায়ে বড় জোর বেড়েছে, দাঁড়াও তোমার পিসি ডাকা আমি বন্ধ করছি।" মাথার বালিশটা বিন্ধ্যবাসিনী ছেলের মুখে চাপা দিয়ে পাগলের মতো বলতে লাগল, "ডাক, ডাক দেখি এবার তোর পিসিকে।"

শিশু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় সবলে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। ধস্তাধস্তির ফলে বালিশটা এদিক ওদিক একটু সরে গেলেই ছেলের গোঁ গোঁ কান্নার শব্দ বিন্ধ্যবাসিনীর কানে আসে। দুর্জয় ক্রোধে উন্মত্ত বিন্ধ্যবাসিনী আরও প্রাণপণ শক্তিতে চাপতে থাকে।

কতক্ষণ এ যুদ্ধ চলেছে? এক মিনিট? এক যুগ? বিন্ধ্যবাসিনী তা জানে না। সে শুধু স্মরণ করতে পারে ক্রমে অবাধ্য শিশুর প্রতিরোধের বেগ কমে এল। হাতপা ছোঁড়া শান্ত হয়ে গেল। বালিশের নীচে থেকে অবরুদ্ধ কান্নার ক্ষীণতম শব্দও শোনা গেল না। পাজী হতভাগা ছেলে কোথাকার। এতক্ষণে টিট হয়েছে। বিছানার পাশে বসে বিন্ধ্যবাসিনী হাঁপাতে লাগল। উত্তেজনায় ও পরিশ্রান্তিতে তার দেহ স্বেদসিক্ত ও কণ্ঠ তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়েছে।

হঠাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর খেয়াল হল, ছেলের কোনো সাড়া শব্দ নেই তো। তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর থেকে বালিশ চাপাটা সরিয়ে দিল। শিশুর ছোট চোখ দুটি মুদ্রিত। শরীর অসাড়। ঘুমুচ্ছে কি? কৈ, নিঃশ্বাস পড়ছে না তো। আতঙ্কে বিন্ধ্যবাসিনীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। নরম হাত দুটি তুলে নিজের গালের উপরে রাখল। ঠাণ্ডা কিংবা গরম ঠিক বুঝতে পারল না। পায়ের তলায় হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করল। নিশ্চিন্ত হল না। তার বুকের উপর কান পেতে শুনল। হৃদ্‌স্পন্দনের আভাস মাত্র পেল না। কানের কাছে 'খোকন' 'খোকন' বলে বার বার ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকল। সাড়া পেল না। ক্ষুদ্র নিথর নিস্পন্দ দেহটিকে দু'হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝি শিশুকে জাগাতে চেষ্টা করল। তার পরে "ওঃ মাগো" বলে চেঁচিয়ে উঠে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বিন্ধ্যবাসিনীর যখন জ্ঞান হল, তখন রাত্রি গভীর। ঊর্ধ্বে কৃষ্ণপক্ষের আকাশ চন্দ্রহীন। নিঃশব্দ রজনীর নিবিড় তিমিরাবেষ্টনে সমস্ত গ্রামখানি নিদ্রালস। সেই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু শূন্য গৃহে পুত্রহন্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর অসহ্য শোকভার নিষ্ফল আর্তনাদে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

পরদিন রাত্রে প্রতিবেশিনীদের অলক্ষ্যে বিন্ধ্যবাসিনী চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্যহীন ভাবে চলতে চলতে নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নদীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে ঝুরিজটে ঘেরা বিপুল প্রাচীন বটগাছটির নবপল্লবের মৃদু আন্দোলনে কিসের নির্দেশ? পরপারে অস্পষ্ট তরুশ্রেণীর ঝাপসা ছায়া ছবিতে দুর্ভাগিনী বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য

কিসের ইঙ্গিত? স্রোতস্বতীর কালো জলের উপরে ঘনসন্নদ্ধ অন্ধকারে কোন্ অজ্ঞাত জগতের আহ্বান?

ঝুপ করে একটা শব্দ হল। শান্ত নদীর নিস্তরঙ্গ জলে ক্ষণিকের একটা আলোড়ন উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

রসের বিচারে বিন্ধ্যবাসিনীর কাহিনীর ঐখানেই ভাবসঙ্গত সমাপ্তি। কিন্তু পুলিশের কাছে সাহিত্যিক সার্থকতার চাইতে ঘটনার দাম বেশী। অক্ষম গ্রন্থকারের মতো তারাও উপাখ্যানের কোথায় থামতে হয় জানে না। ইন্সপেক্টারবাবু আরও তথ্য যোগ করতে লাগলেন। বৃহদায়তন উপন্যাসের শেষে যেমন পরিশিষ্ট, তিনপাতা চিঠির তলায় যেমন পুনশ্চ।

যে মানুষ ছোটবেলায় মাছের মতো সাঁতার কেটে, প্রত্যহ দীঘির এপার-ওপার করেছে, তার পক্ষে জলে ডুবে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। জলের নীচে দম আটকে এলে বিন্ধ্যবাসিনীর হাত-পাগুলি আপনি সচল হয়ে দেহটাকে উপরে ভাসিয়ে তোলে। জেলেদের নৌকায়—

বাধা দিয়ে বললাম, "থাক, কে কোথায় কী ভাবে তাকে জল থেকে উদ্ধার করল, কী করে কবে সে গ্রাম থেকে শহরে এল এসব বৃত্তান্ত থানায় ডায়েরী করার পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কোর্টে উকীলের জেরার পক্ষেও বোধ হয় মূল্যবান মালমশলা। আমার কাছে সে সব অনাবশ্যক খুঁটিনাটি মাত্র।"

সুধীরবাবু ক্ষুণ্ণ হলেন কিনা জানি নে। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিন্ধ্যবাসিনীর কনফেশান—"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "আমি বিশ্বাস করি কি? করি। তার এক বর্ণও মিথ্যা মনে হয় না।"

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে তিনিই আবার প্রশ্ন করলেন, "এখন আমার কী করা উচিত; বলুন তো?"

তা আমার বুদ্ধির অতীত। বললাম, "আমরা সম্পাদকেরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। জন্মশাসন থেকে কিউবিজম্ এবং কমন মার্কেট থেকে ডেফিসীট ফাইন্যান্স সব বিষয়েই আমরা অনায়াসে উপদেশ বা এক্সপার্ট

ওপিনিয়ন দিতে পারি। কিন্তু স্বীকার করছি, বিন্ধ্যবাসিনী সম্পর্কে কী করা উচিত তা জানি নে।"

ভদ্রলোক হতাশ হলেন। তাঁকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিতে গেলাম। দু'পা গিয়ে হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন, "খবরটা আপনার কাগজে কালই বেরোবে বোধ হয় ?" তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগের চিহ্ন গোপন রইল না।

আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ব্লক টাইপের ব্যানার-হেডিং ভেসে উঠল,—"নিরুদ্দেশ বিন্ধ্যবাসিনীর চাঞ্চল্যকর আত্মপ্রকাশ।" "পদস্থ পুলিশ অফিসারের গৃহে অতর্কিতে আবির্ভাব।" পথে পথে হিন্দুস্থানী হকারেরা সাইকেলে কাগজের গোছা নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে ছুটছে—"টিলীগ্রাফ্, বিন্ধ্যবাসিনীকা খবর নিকলেছে। জনম্‌ভূমি পড়্‌হিয়ে, জনম্‌ভূমি—"

কিন্তু মন স্থির করতে সময় লাগল না। একটা চাঞ্চল্যকর "স্কুপ" এবং পত্রিকার হাজার দশেক কপি অতিরিক্ত বিক্রির নিশ্চিত সুযোগ স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করলাম। জানি, সম্পাদকীয় কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটল। সার্কুলেশান ম্যানেজার জানতে পারলে আমার আর মুখ দেখবেন না।

দিনান্ত

অনেক রাত অবধি চোখে ঘুম আসে নি বলেই বোধহয় ভোরের দিকে শান্তনু অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মাথার কাছে কিসের একটা শব্দে জেগে উঠল।

কেউ দরজা ঠেলছে কি? এইতো সবে রাত্রির অন্ধকার কেটে আকাশে দিনের আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। সূর্য উঠতে এখনও বাকি। এত সকালে কে এল?

শান্তনুদের ফ্ল্যাটটি গলির মোড়ে একটা বাড়ির তিনতলায়। সামনে রেলিংঘেরা ছোট একফালি বারান্দা। তারই গায়ে শোবার ঘর। শান্তনু দরজা খুলে বারান্দায় চেয়ে দেখল। কই, কেউ কোথাও নেইতো। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল পায়ের কাছে রবারের ব্যাণ্ড-জড়ানো ভাঁজ করা খবরের কাগজটা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। সাইকেলের হাতলের উপরে স্তূপীকৃত পত্রিকা বিলি করা যাদের কাজ তিন-চার তলার সিঁড়ি বেয়ে প্রতিটি গ্রাহকের হাতে তা পৌঁছে দেওয়া তাদের চলে না। চলন্ত সাইকেলে যেতে যেতে তারা ভাঁজকরা কাগজখানা উপরের ছাদে বা বারান্দায় ছুঁড়ে দেয়। আজ নীচে থেকে সজোরে নিক্ষিপ্ত কাগজটা ঘরের কাঠের দরজার উপরে এসে পড়েছে; তারই আওয়াজে শান্তনুর ঘুম ভেঙে গেছে।

কাগজটা কুড়িয়ে দিতে গিয়ে শান্তনুর মনে হল, আশ্চর্য হাতের তাক ওদের। একদিনও বাইরে বা এদিকে ওদিকে গিয়ে পড়ে নাতো। আউটফিল্ড থেকে উইকেটে বল ছুড়ে ওরা অনায়াসেই বোধহয় ব্যাটস্‌-ম্যানকে রান-আউট করতে পারে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি শান্তনুর ওষ্ঠাধরে ঈষৎ একটু করুণ হাসির রেখা দেখা দিল।

শান্তনুর চোখে ঘুমের রেশটা তখনও কাটে নি। অন্যদিন সে

কাগজখানা টেবিলের উপরে তুলে রেখে আবার শুয়ে পড়তো। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে সে এমন প্রবল এক ঔৎসুক্য বোধ করল যা রোধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজখানা খুলে পড়তে শুরু করল।

যে খবরটায় শান্তনুর আগ্রহ সে আজ পত্রিকার শুধু একটি বিশেষ পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নয়। টাইটেল পেইজ অর্থাৎ প্রথম পাতায় তিনকলমের হেডলাইন দিয়ে তার আরম্ভ। "নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতার" রিপোর্টে খেলার পাতার সবখানি জুড়ে তার বিস্তারিত বিবরণ। খানতিনেক ছবি, অতীতের নামজাদা একজন খেলোয়াড়ের লেখা বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, যাকে বলা হয় এক্সপার্ট কমেণ্টারী—সব কিছু মিলিয়ে ঢালাও ব্যবস্থা। এ-কথা মানতেই হবে, স্পোর্টস কভারেজ অর্থাৎ খেলাধুলার খবরে "বিশ্ববার্তা"র খ্যাতিটা অহেতুক নয়।

অবশ্য বিষয়টা তার নিজের গুরুত্বেই পত্রিকায় মুখ্য সংবাদ হওয়ার দাবি রাখে। রাজ্যপাল ট্রফির ফাইন্যাল শহরের ক্রিকেটে সেরা প্রতিযোগিতা। বিজয়ীর তো কথাই নেই, রানার্স-আপেরও সম্মান কম নয়। কোন দল কতবার ফাইন্যালে উঠেছে সেটাও একটা গর্বের বিষয়। স্বদেশী উইসডেনে সন তারিখ সহ তার তালিকা ছাপা হয়।

আরও একটি বিশেষ কারণে এ-বছরের খেলাটায় উত্তেজনার অংশ বেড়েছে। এবার ফাইন্যালে খেলছে ব্লু ডায়মণ্ডস্ এবং সিটি ইয়ঙ্গস্। স্থানীয় খেলার জগতে তুই প্রবল পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী। পার্লামেণ্টে যেমন কংগ্রেস ও জনসঙ্ঘ। পশ্চিম এশিয়ায় যেমন আরব ও ইস্রায়েল।

শুধু ময়দানেই নয়, শহরের স্কুল, কলেজ, গৃহ ও পরিবারে খেলার অনুরাগী নবীন ও প্রবীণেরা তুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। হয় ব্লু ডায়মণ্ড-এর সমর্থক নয়তো সিটি ইয়ঙ্গস-এর পক্ষপাতী। ট্রামে, বাসে, আপিসের টিফিন ঘরে ও পাড়ায় রকের আড্ডায় তুই দলের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলে। কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটি ঘটে।

সিটি ইয়ঙ্গস্ গত তু'বছর পর পর ফাইন্যালে জিতেছে। এবার

জিতলে হ্যাট্‌ট্রিক, রাজ্যপাল ট্রফিতে অভূতপূর্ব রেকর্ড। ব্লু ডায়মণ্ডস্ বহুদিনের ঐতিহ্যশালী ক্লাব ; এ-বছর তাদের পঁচিশ বৎসর পূর্তি। সিটি ইয়ঙ্গস্‌কে হারিয়ে ট্রফি ঘরে তুলতে পারলে রজত জয়ন্তী উৎসবের আলোক সজ্জাটা উজ্জ্বলতর হবে। যদিও লড়াইটা প্রাণের লড়াই নয়, মানের লড়াই, তবু দুই দলই প্রাণপণে লড়ছে।

খবরের কাগজে গতকালের খেলার বিবরণে আগাগোড়াই বিকাশ বোসের প্রশংসা। তার ব্যাটিং-এর সুখ্যাতি, বোলিং-এর ব্যাখ্যান ও ফিল্ডিং-এর গুণগান। একেবারে গদগদ ভাব।

বিকাশ বোস চৌকশ, ইংরেজীতে যাকে বলে অলরাউণ্ডার। উঠতি খেলোয়াড়। সে-কথা শান্তনু অস্বীকার করে না। ছেলেটার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, প্রমীজ আছে। লেগে থাকলে এবং হাততালিতে মাথা গুলিয়ে না গেলে একদিন ভালোই খেলবে একথাও শান্তনু মানতে রাজী আছে। সে নিজে স্পোর্টসম্যান, অন্য কারুর সত্যিকার কৃতিত্বকে ছোট করবে এমন হিংসুটে সে নয়। কিন্তু সব কিছুরই একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই তো। রাজ্যপাল ট্রফিতে এর আগে আর কেউ যেন সেঞ্চুরী করে নি!

আসল কথা, বিকাশ বোস বড় লোকের ছেলে, চেহারাটাও ভালো। অ্যাম্বাসডর গাড়ি চালিয়ে মাঠে আসে। আলাপ হলেই দরাজ হাতে চা, লিমোনেড খাওয়ায়। পত্রিকার রিপোর্টারদের আর ণত্ব ষত্ব বোধ থাকে না। লিখেছে—"বাংলার ব্রাডম্যান।" ছিঃ ছিঃ, চাটুকারিতার কি কোনো সীমা থাকতে নেই? শান্তনু অবাক হয়ে ভাবে।

শুধু বিকাশ বোসের গুণগানই নয়, শান্তনুকে খাটো করারও সুস্পষ্ট প্রয়াস। তার ব্যাটিং-এ ব্যর্থতা, ফিল্ডিং-এর ত্রুটি ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করে ক্রীড়া সম্পাদক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ক্রিকেটার হিসাবে শান্তনু অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, বর্তমানে সে নিতান্তই স্পেণ্ট ফোর্স। বারুদহীন তুবড়ির খোল।

সন্দেহটা ক্রিকেট মহলে আর কারুর মনে হয়েছে কি না জানা নেই। তার এমন নির্মম প্রকাশ্য ঘোষণা এই প্রথম। ছাপার অক্ষরগুলি

শান্তনুর বুকের মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ কাঁটার আঘাতের মতো সজোরে বিঁধল। তার সমস্ত শরীর যেন ব্যথায় অসাড় হয়ে এল।

"বিশ্ববার্তা"র ক্রীড়া সম্পাদক অনিল নন্দী মানুষটা উদ্ধত, দুর্মুখ। পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিজের খুশিমতো যা-কিছু লিখবার সুযোগ আছে বলেই ধরাকে সরা জ্ঞান করে। শান্তনু লোকটাকে কোনদিনই পছন্দ করে না। হামবাগ্ কোথাকার!

অথচ কথাটাকে একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার মতো জোরও শান্তনু নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না। সে যে কাল প্রথম বলেই আউট হয়ে গেছে সে-ক্ষোভ তো সে নিজেই ভুলতে পারছে না। সত্যি তো, এ মরশুমে সে একটা খেলায়ও উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারে নি। এমন কি ক্লাবের ম্যাচ, সেখানেও তার অ্যাভারেজ নীচের ধাপে।

রাজ্যপাল ট্রফির ফাইন্যালে শান্তনু খেলবে কি না সে সম্পর্কে ক্লাবের অনেকের মনেই সংশয় ছিল। শোনা যায়, সিলেকশান কমিটিতেও তার নির্বাচন নিয়ে মতভেদ ছিল। টিমের ক্যাপ্টেন তো তাকে দলে নিতে খুবই আপত্তি করেছিলেন। কমিটির সভাপতি মধুসূদনবাবুর কাস্টিং ভোটে শান্তনু দলভুক্ত হয়েছে।

'মধুদা' শান্তনুর রক্ষক, শুভানুধ্যায়ী ও উপদেষ্টা। ফ্রেণ্ড, ফিলসফার এ্যাণ্ড গাইড। বালক শান্তনুর মধ্যে যে ক্রিকেটে দক্ষতার বীজ ছিল সে তাঁরই চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল। বাগানের মালীর মতো তিনি সযত্ন পরিচর্যায় তাকে অঙ্কুরিত ও পরে বিরাট মহীরুহে পরিণত করেছিলেন।

শান্তনুর বাবা লিলুয়ায় রেলের কারখানায় কেরাণী ছিলেন। ছেলে কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাশ করলেই রেলের উপরওয়ালাদের ধরে কোনো একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে নেবেন, এই ছিল তাঁর অভিলাষ। ছেলে খেলা নিয়ে মাতবে এ তাঁর পছন্দ ছিল না। মধুদাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে পিতার বিধিনিষেধ শিথিল করেছিলেন। স্কুলে ফ্রি-শিপ, কলেজে স্টাইপেণ্ড এবং সি-এ-বিতে কোচিং তাঁরই চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। স্কুল ইলেভেন থেকে টেস্ট টীম অনেকখানি পথ। নিজের যোগ্যতা যত বেশীই হোক না কেন ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাদের সহায়তা ছাড়া সে দূরত্ব

অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। শান্তনুকে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগও মধুদা'ই করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শান্তনুর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শান্তনু চমকে উঠল। সাড়ে সাতটা বাজে যে। ন'টার মধ্যে প্যাভিলিয়নে হাজির হতে হবে। তার আগে দাড়ি কামানো, স্নান, খাওয়া, জামা কাপড় পরে তৈরী হওয়া চাই। বুট জোড়াতেও সাদা চক মাখানো প্রয়োজন। শান্তনু খবরের কাগজটা একপাশে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শান্তনু ক্যাম্বিসের ব্যাগে তার ব্যাট, প্যাড, ব্যাটিং গ্লাভস্, মাথার ক্যাপ, একজোড়া বাড়তি বুট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ভরে নিয়ে সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।

গলি থেকে বড় রাস্তায় কয়েক পা গেলেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। বাঁ হাতের ঘড়িতে তাকিয়ে শান্তনু ভাবল, এখনও ঢের সময় আছে। বাসে গেলেই তো চলে। অনর্থক ট্যাক্সি ভাড়ায় টাকা নষ্ট করা কেন? টাকা-কড়ি সম্পর্কে শান্তনু সম্প্রতি খুব সচেতন হয়েছে। সে ধীরে ধীরে তার ব্যাগ নিয়ে রাস্তার ওপারে বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়াল।

বাসের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীদের একজন শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কাছে এগিয়ে এসে বলল, "কে, শান্তনু নয়? চিনতে পারছ? টাউন স্কুলে,—আমার নাম—"

নাম বলার প্রয়োজন ছিল না। শান্তনু অনায়াসেই চিনতে পারল। স্কুলের সহপাঠী সুধীর সরকার, ক্লাশে নামকরা মেধাবী ছাত্র ছিল। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছিল। সে আজ কত বছর আগেকার কথা।

শান্তনু বলল, "গোড়াতে চিনতে পারি নি। বেশ গোল-গাল নাদুস-নুদুস চেহারা হয়েছে যে। কোথায় আছিস? করছিস কি? এখনও ফ্রি বুকলেট যোগাড় চলছে কি?"

ছাত্রজীবনে সুধীরের নেশা ছিল খবরের কাগজের কুপন ডাকে দিয়ে নানা জিনিসের বিনামূল্যে বিতরিত সচিত্র পুস্তিকা সংগ্রহ করা। এত দিন পরে কৈশোরের সেই ছেলেমানুষীর কথা স্মরণ করে দু'জনেই খুব হেসে নিল।

সুধীরের খবর গতানুগতিক। বি-এ পরীক্ষার আগে হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। রেসাল্ট ভালো করা আর সম্ভব হল না। টাইপরাইটিং শিখে একাউন্টেন্ট জেনারেলের আপিসে কেরাণী হয়ে ঢুকেছে। এতদিনে একটা প্রমোশনও পেয়েছে।

নিজের কাহিনী শোনাতে শান্তনু বলল, "আমার খবর যথাপূর্বং। স্কুলে লেখাপড়ায় যেমন ঢু ঢু, এখন কাজের বেলায় তেমনি অকাজ, ভ্যাগাবণ্ড বললেই হয়।"

সুধীর বাধা দিয়ে বলল, "বাজে বকিস নে। তোর খবর কে না জানে? রোজ পত্রিকায় ছবি বেরোয়, দেশজোড়া নাম ডাক। আমার ছোট ছেলেটা তো তোর মস্ত এক ভক্ত। মনে পড়ে আমাদের ইংরেজীর টীচার সাধনবাবুকে? সেই যে ক্লাশে ক্রিকেটের কথা উঠলেই নাক সিঁটকে বলতেন, 'হিটিং এ লেদার বল উইথ এ পীস অব উড'—তাঁর সঙ্গে সেদিন এক বিয়ে বাড়িতে দেখা হয়েছিল। তিনি অবধি তোর নাম করছিলেন।"

সুধীরের বাস এসে গেল। বিদায় নেওয়ার আগে নিজের ঠিকানা দিয়ে গভীর আন্তরিকতার স্বরে বলল, "আসিস একদিন আমাদের ওখানে। আমরা সবাই তোর কৃতিত্বে আনন্দ বোধ করি, রিয়্যালী প্রাউড অব ইউ।"

কথাটায় নূতনত্ব নেই। ক্রিকেটে তার খ্যাতি কম হয় নি। চিত্রতারকাদের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, 'ফ্যান' সংখ্যা তারও নেহাৎ অল্প ছিল না। কিন্তু আজ যখন তার ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অক্ষমতা নিয়ে নির্দয় সমালোচনার ঝড় বইছে তখন বহুদিন বিস্মৃত বাল্যবন্ধুর শিশুপুত্রের এই শ্রদ্ধার সংবাদটুকু শান্তনুর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল।

প্যাভিলিয়নে ঢুকতেই মধুসূদন দা'র সঙ্গে দেখা।

"এই যে শান্তনু, মুখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? না, না অমন মনমরা হয়ে পড়লে চলবে না। ডোণ্ট বি ডিপ্রেসড। সব ক্রিকেটারদেরই খেলার জীবনে কখনও কখনও একটা বন্ধ্যা সময়, লীন প্যাচ আসে, আবার কেটে যায়। হ্যামণ্ডের হয়েছে, হাটনের হয়েছে, আমাদের মার্চেণ্ট,

অমরনাথ কেউ বাদ যায় নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ তুমি নিশ্চয়ই ভালো খেলবে। চাই একটু সাহস আর একাগ্রতা, বোল্ডনেস এ্যাণ্ড কন্‌শেনট্রেশান" বললেন মধুসূদন দা'। স্নেহভরে শান্তনুর পিঠ চাপড়ে দিলেন। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে গলার স্বর নীচু করে যোগ করলেন, "সে-টাকাটার চিন্তা করছ বুঝি? কোনো ভাবনা নেই। আমি সেক্রেটারীর মত করিয়েছি, ও ঠিক ম্যানেজিং কমিটিতে পাশ হয়ে যাবে। যাও এবার ড্রেসিং রুমে, প্যাড পরে তাড়াতাড়ি তৈরী হও দিকিন।"

টাকাটার জন্য ভাবনা ছিল এবং আছে। বাড়ি থেকে বের হবার সময় আজও স্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, বুধবারের মধ্যে নন্টুর ফিজ জমা না দিলে মেডিক্যাল কলেজে সে ঢুকতে পারবে না। অ্যাডমিশন ফি, এক টার্মের মাইনে, লেবরেটারীর জমা, কলেজ ইউনিয়নের চাঁদা ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে শ' কয়েক টাকার ধাক্কা।

এর আগে শান্তনুকে টাকার জন্য খুব ভাবতে হয় নি। সবাই জানে, খেলাটা এ দেশে এখনও পুরোপুরি পেশা নয়। প্রকাশ্যে খেলোয়াড়েরা যা পায় সেটা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু নামজাদা খেলোয়াড়দের দলে আনতে এবং দলে ধরে রাখতে অপ্রকাশ্যে যে টাকা লেনদেন হয় সেটা অবশ্য তুচ্ছ নয়। ইতিপূর্বে যখনই থোক টাকার দরকার হয়েছে, চাওয়া মাত্রই সে ক্লাব থেকে পেয়েছে। এবার মাস খানেক আগেই সে ছেলের কলেজে ভর্তি হওয়ার অর্থসমস্যাটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল। কিন্তু এখনও সেখান থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি।

মেম্বারস গ্যালারীতে ক্লাবের সদস্যরা অনেকেই এসে গেছেন। পাইপ বা সিগার মুখে বিলাতী স্যুটে ঢাকা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সাহেব, ধুতির উপরে আজানুলম্বিত কোটপরা মাড়োয়ারী ধনকুবের এবং গায়ে সার্জের পাঞ্জাবী ও কাঁধে ভাঁজকরা কাশ্মীরী শাল নিয়ে বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান।

অনেক মহিলাও আছেন। বহু বর্ণাঢ্য শাড়ি জাম্পারে রঙিন প্রজাপতির মেলা। লাল, সবুজ, মেরুন ও টারকোয়েজ রঙের বেলবটমেরও কমতি নেই। অনেকের চোখে গোল চৌকো বা ডিম্বাকৃতি

বিচিত্র ফ্রেমের সান্ গ্লাস। তরুণীদের কারো কাঁধে স্ট্রাপ দিয়ে ঝুলছে ক্যামেরা কারো বা হাতে বাইনোকুলার। প্ল্যাস্টিকের হ্যাণ্ড ব্যাগে উল ও নিটিং-এর সরঞ্জাম নিয়ে এসেছেন কেউ কেউ। অ্যাস্কট বা মহালক্ষ্মীর রেসকোর্সের মতো শীতের মরসুমে ইডেনগার্ডেনসেও অঘোষিত ফ্যাশন-প্যারেডের একটা সুযোগ পাওয়া যায়।

দূর থেকে শান্তনুর মনে হল তাঁদের কেউ কেউ তার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছেন! বোধহয় তার ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করছেন। বোধহয় নয়। সবই শান্তনুর অপরাধী মনের কষ্টকল্পনা মাত্র।

ড্রেসিং রুমের দরজার পাশেই গ্রাউণ্ড সেক্রেটারীকে ঘিরে জনকয়েক তরুণ সদস্যদের কী জটলা চলছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে শান্তনু ঘরে প্রবেশ করল। দু'চারটে কথার ভগ্নাংশ ও মন্তব্যের টুকরো তার কানে এল,—"অমন রান-আউটের চান্সটা মাটি না হলে আর ভাবনা ছিল কি?" "একটা লাইফ পেয়েছিল, তাই তো সুদর্শন দলের ভাঙনটা রুখতে পারল"; "শেষের অতগুলি রান তো স্রেফ দাতব্য, ফ্রি গিফট" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সকল উক্তির লক্ষ্যটা যে কে এবং কারণটা-ই বা কি তা বুঝতে শান্তনুর বিলম্ব হল না। সে কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘরের অপরপ্রান্তে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

নিন্দায় অবিচলিত এবং স্তুতিতে নিরুৎসুক সাধু সন্ন্যাসী মঠে মন্দিরে অবশ্যই আছেন। সংসারের সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরুদ্বেগ নির্লিপ্ততা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন ধরে যে খেলোয়াড় আপন ক্রীড়াশৈলে অগণিত দর্শকের মনোরঞ্জন করেছে তার পক্ষে তো নয়ই। রাগে শান্তনুর গায়ে জ্বালা ধরল। যারা খেলে বা খেলেছে তাদের তিরস্কার অন্যায় হলেও মেনে নেওয়া চলে। কিন্তু জীবনে কোনো দিন যারা ব্যাট ছোঁয় নি সে-সব আর্মচেয়ার ক্রিকেটারদের টীকা-টিপ্পনি অসহ্য।

"শান্তদা, তুমি কি মডার্ন ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ?"

প্রশ্ন কর্তা সীতেশ। ক্লাবের একজন সদস্য, শান্তনুর বন্ধুস্থানীয়। সে যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শান্তনু তা লক্ষ্য করে নি।

"চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি? না, তো। কে বললে তোমাকে?" পাল্টা প্রশ্ন করল শান্তনু।

অপ্রতিভ সীতেশ লজ্জিত কণ্ঠে বলল, "না, কেউ বলে নি। শুনছিলেম মডার্ন ব্যাঙ্ক না কি একজন তুখড় ব্যাটসম্যান খুঁজছে। তাই ভাবলাম তুমি বুঝি অন্য কোনো আপিসে,—ভুল খবর বুঝতে পারছি। আশা করি, কিছু মনে কর নি শান্তদা।" ত্রস্তপদে সীতেশ সেখান থেকে সরে পড়ল।

কিছু মনে না করে থাকার উপায় ছিল না। শান্তনু জানে "ওয়েলফেয়ার অফিসার"-এর চাকুরিটা নিতান্তই নামকাবস্তে। আসলে ব্যাঙ্কের ক্রিকেট টীমকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই ঐ চাকরিটার সৃষ্টি; একজন দক্ষ খেলোয়াড়কে মাইনে দিয়ে দলে রাখার ছুতো। কর্তৃপক্ষ ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে আপিসের কাজ প্রত্যাশা করেন না, অফিস লীগে রান কামনা করেন।

এতক্ষণে শান্তনু বুঝতে পারল কেন আপিসের সুপারভাইজার সাহেব কদিন থেকে পিছনে লেগেছে। সুধীরের কথাগুলি শান্তনুর মনে পড়ল,—আপিসে মাইনে বেশী নয়, খাটুনিও অনেক। তবে চাকুরিটা স্থায়ী। পেন্সন আছে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটিও পাবে, বুড়োবয়সে একেবারে পথে দাঁড়াতে হবে না। সুধীরের কণ্ঠে যে একটা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার সুর ছিল সেটা শান্তনুর কান এড়ায় নি।

কিন্তু চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকার সময় ছিল না। খেলা শুরু হবে। সাদা অ্যাপ্রন পরিহিত আম্পায়ার দু'জন মাঠে নেমে গেছেন। শান্তনু তাড়াতাড়ি প্যাড পরে তৈরী হয়ে নিল।

ব্লু ডায়মণ্ডসের দ্বিতীয় ইনিংস গতকাল দিনের একেবারে শেষ ভাগে শুরু হয়েছে, ওপেনিং পেয়ার—শশাঙ্ক ও জলিল—তাদের অসমাপ্ত খেলার খেই ধরে ব্যাট করতে গেল।

প্যাভিলিয়ন ও মাঠের চারদিকে দর্শকদের স্ট্যাণ্ডে ব্লু ডায়মণ্ডস্-এর সমর্থকেরা আনন্দে উৎফুল্ল। সিটি ইয়ঙ্গসকে হারিয়ে ট্রফি জেতার জন্য চাই মাত্র আর দু'শো রান। সময় আছে পুরো দিনটা, হাতে আছে সব

ক'টি উইকেট। জয়লাভের পক্ষে এর চাইতে আশাজনক সুযোগ কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে আগের দিনের রান সংখ্যায় কিছু যোগ হওয়ার আগেই স্লিপে ক্যাচ তুলে শশাঙ্ক আউট হয়ে গেল। না, অয়মারম্ভ শুভায় হয় নি।

শান্তনু ওয়ান-ডাউনে ব্যাট করে। কিন্তু ক্যাপ্টেন আজ বিকাশ বোসকে পাঠালেন সে জায়গায়। পরিবর্তিত ব্যাটিং অর্ডারে শান্তনুর নাম অনেক নীচে,—ছ'নম্বরে। ক্যাপ্টেনকে দোষ দেওয়া চলে না। এ বছরে পর পর প্রায় সবগুলি ম্যাচ, বিশেষ করে এ খেলার প্রথম ইনিংসে, শান্তনুর শোচনীয় ব্যর্থতায় তার উপরে ভরসা রাখা যে কোনো অধিনায়কের পক্ষেই কঠিন।

বিকাশ ব্যাট করতে মাঠে নামামাত্রই দর্শকেরা হাততালিতে তাকে স্বাগত জানাল। এই উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় আগের ইনিংসের মতো এবারেও সিটি ইয়ঙ্গসকে হিমশিম খাইয়ে ছাড়বে সে সম্পর্কে তার দলের সমর্থকদের মধ্যে আশা এবং বিরোধী দলের মনে উদ্বেগের অবধি ছিল না। সুতরাং সিটি ইয়ঙ্গস্-এর ফাস্ট বোলার রামানাথন যখন প্রথম বলেই বিকাশের মাঝের স্ট্যাম্পটি উপড়ে ফেলল তখন সমস্ত মাঠটাই যেন বিস্ময়বিমূঢ় নিস্তব্ধতার ভারে থম থমে হয়ে উঠল।

ব্লু ডায়মণ্ডস্ এর পরবর্তী ব্যাটসম্যান অসাধারণ না হলেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। স্পেক্টাকুলার নয়, কিন্তু স্টেডী। তার কাছে সব ম্যাচেই অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ রান আশা করা যায়। দু'রান তুলে সে বিদায় নিল। যে তার স্থলাভিষিক্ত হল, তারও সেই দশা। রামানাথন আজ দুর্ধর্ষ।

কোনো উইকেট না খুইয়ে সাতাশ রান থেকে মিনিট কুড়ির মধ্যেই পাঁচ উইকেটে আটত্রিশ। ব্লু ডায়মণ্ডস্-এর ধস নেমেছে যেন। ইংরেজীতে যাকে বলে ল্যাণ্ডস্লাইড।

এবার শান্তনুর পালা। সে প্যাভিলিয়নের বারান্দা পার হয়ে মাঠে নামছিল। কানে এল কোনো এক অপরিচিত দর্শকের উক্তি—"হায়, ইনি তো রিটার্ন-টিকিটের যাত্রী" আর একজন খোঁচাটাকে আরও ধারালো

করে বলল, "আগের ইনিংসে করেছেন লাড্ডু, এবার করবেন রসগোল্লা।"

শান্তনু মনকে দৃঢ় করেছিল। কোনো কিছুতেই সে বিচলিত হবে না। সে যুঝবে। শুধু বিপক্ষদলের বোলারের বিরুদ্ধে নয়, নিজের অপ্রসন্ন ভাগ্যের সঙ্গেও।

কিন্তু ভাগ্য, বিশেষ করে পুরুষস্য, নাকি দেবতাদেরও অজ্ঞেয়, শান্তনু কোন ছার। প্রথম বলটা শান্তনুর ব্যাট এড়িয়ে উইকেটের গা ঘেঁষে চলে গেল। শুধু এক চুলের জন্য অফ স্টাম্পটি ছোঁয় নি। দ্বিতীয়টা এসে লাগল পায়ে। "হাউজ দ্যাট?" উইকেট কীপার, বোলার ও শ্লিপের ফিল্ডার সমস্বরে চেঁচিয়ে আম্পায়ারের কাছে আপীল জানাল। শান্তনু সভয়ে আম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল। না, আম্পায়ার তাঁর তর্জনী ঊর্ধ্বে উঁচিয়ে ধরেন নি। শান্তনুর কপালে স্বেদবিন্দু জমেছিল, রুমাল দিয়ে মুছে ফেলল।

কথায় বলে, বার বার, তিনবার। তৃতীয় বলটা এল প্রায় বুলেটের গতিতে। শর্টপীচ বল। শান্তনুর বুকের কাছে লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তে শান্তনু তার ডান পা অফ স্টাম্পের বাইরে ও শরীরটাকে বলের লাইনের পুরোপুরি পিছনে নিয়ে মরীয়া হয়ে সজোরে ব্যাট হাঁকালো। প্রচণ্ড হুক। বলটা ফাইন লেগের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচু পথে গিয়ে পড়ল বাউণ্ডারী লাইনের বাইরে। সিক্সার,—এই ম্যাচে প্রথম ছ'-এর মার।

ভাগ্যদেবীর বাসস্থানটা বোধহয় কাছাকাছিই ছিল। ঐ ছক্কার ধাক্কায় বুঝি তার দরজাটা খুলে গেল। শান্তনু পিটিয়ে খেলতে লাগল। বেপরোয়া ড্রাইভ, পুল ও গ্ল্যান্স করে বলটাকে চক্ষের পলকে বার বার ফিল্ডারদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে পাঠাল। ঘন ঘন বোলার বদল, নানা ভাবে ফিল্ড সাজানো, কোনো কিছুতেই শান্তনুর রানের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা গেল না। এরই মধ্যে তার জুটির দু'-জন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছে।

শান্তনুর নিজস্ব রানসংখ্যা পঞ্চাশ পার হয়ে গেল। ব্লু ডায়মণ্ডস্-এর শিবিরে উচ্ছ্বসিত উল্লাস। সিটি ইয়ঙ্গস দলের খেলোয়াড়েরা ভগ্নোদ্যম, সমর্থকেরা হতবাক।

বিপর্যস্ত ও ক্রুদ্ধ রামানাথন থেকে থেকে বাম্পার ছুঁড়ছিল। তার কোনোটাকে শান্তনু ব্যাটের ঘায়ে পাঠিয়ে দিল আউটফিল্ডে, কোনোটা বা ফসকে এসে ঠেকল তার বুকে, বাহুতে ও হাতের কব্জিতে। একটা সবেগে আঘাত করল তার কপালে। কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল মুখে, চোখে ও সার্টের কলারে। মাথা ঘুরতে লাগল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। পায়ের তলায় মাটিটা বুঝি দুলছে। ক্ষতস্থানে রুমাল চাপা দিয়ে ক্রীজের উপরে শান্তনু বসে পড়ল। আম্পায়ার ও ফিল্ডারদের কাঁধে ভর দিয়ে আহত ব্যাটসমান ফিরে গেল প্যাভিলিয়নে। রিটায়ার্ড হার্ট।

সমস্ত মাঠে গভীর বিষাদের ছায়া নামল।

অপরিহার্য ক্ষণিক বিরতির পরে পুনরায় খেলা শুরু হল। কিন্তু ন' নম্বর ব্যাটসম্যানের কাছে কেউ কিছু আশা করে না। কোনো মতে মিনিট পনের টিকে থেকে সে যখন কট এ্যাণ্ড বোল্ড তখন কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শান্তনু আপন অসমাপ্ত ইনিংস শেষ করতে পুনরায় উইকেটে এসে দাঁড়াল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী বিস্মিত পুলকে উঠে দাঁড়িয়ে বিপুল হর্ষধ্বনিতে তাকে অভিনন্দিত করল।

ব্যাট দিয়ে বল পিটানোই ক্রিকেট একথা শান্তনুর স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক না বলে দিলেও সবাই জানে। কিন্তু শান্তনুর হাতে আজ বোধহয় ব্যাট নেই ; আছে খড়্গ। তারই অবিরাম আঘাতে সে ফাস্ট, সুইং এবং স্পিন বোলিং-এর সকল কলাকৌশলকে নির্বিচারে কচুকাটা করে ছাড়ল। স্কোর বোর্ডে তার রানের অঙ্কটা এগিয়ে চলল, দৌড়ে নয়, লাফিয়ে।

রেডিওর ধারাবিবরণীতে "ম্যাগনিফিশেণ্ট", "সিণ্টেলিটিং", "সুপার্ব" ইত্যাদি বাছা বাছা ইংরেজী বিশেষণগুলি বার বার পুনরাবৃত্তি করেও যেন ভাষ্যকার তৃপ্ত নন। বললেন, যে সকল সমালোচক মনে করেন যে শান্তনুর "হে ডে" অর্থাৎ চরম উৎকর্ষের দিন কেটে গেছে তাঁদের ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান ম্যাচে তার দলভুক্তি সম্পর্কে যাঁদেব আপত্তি ছিল, তাঁরাও নিশ্চয়ই এখন লজ্জিত হবেন। স্ট্রোক প্লেয়ার হিসাবে এখনও শান্তনুর জুড়ি নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খেলা শেষ হল। ব্লু ডায়মণ্ডস্ তাদের অভীষ্ট রানের কোঠায় পৌঁছতে পারল না। কিন্তু শান্তনু রইল অপরাজেয়। একশ আট, নট আউট। উদ্বেল জনতার উন্মত্ত অভিনন্দনের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে প্যাভিলিয়নে নিয়ে যেতে পুলিশ ও হোমগার্ডের ব্যূহ রচনার প্রয়োজন হল।

করমর্দন, আলিঙ্গন, সাধুবাদ ও জয়ধ্বনির আর বুঝি শেষ নেই। সিটি ইয়ঙ্গস্ বিরোধী দল। রেকর্ড সৃষ্টির গৌরব থেকে শান্তনু তাদের বঞ্চিত করেছে, ওষ্ঠাধর থেকে কেড়ে নিয়েছে বিজয়ের উদ্যত পেয়ালা। তাদের সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্যেরাও শান্তনুর কাছে এসে সুখ্যাতি জানালেন। অকপটে স্বীকার করলেন এমন অসাধারণ ক্রীড়া কৌশল আগে তাঁরা কখনও দেখেন নি। সত্যি, শান্তনু এর আগেও একাধিকবার একশ'র উপরে রান করেছে, কিন্তু আজকের সেঞ্চুরী মহত্তম।

সবচেয়ে গর্বিত ও উৎফুল্ল ব্যক্তি মধুদা'। তাঁর প্রস্তাবে ব্লু ডায়মণ্ডস্ তক্ষুণি একটি বিশেষ ঘরোয়া সংবর্ধনা সভার আয়োজন করল।

ক্লাবের সভাপতি শান্তনুর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। সভাপতির স্ত্রী অতি বয়স্কা; শান্তনুর প্রায় মাতৃস্থানীয়। তিনি ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। অন্যান্য সদস্য একের পর এক বক্তৃতায় প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিলেন।

মঞ্চের উপরে মাঝখানে শান্তনুর আসন। তার দু'পাশে ক্লাবের কর্মকর্তাগণ, সম্পাদক, মধুদা ও আরও গণ্যমান্য সদস্য। নীচে সম্মুখের সারিতে বসেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। একটা অংশে লেবেল আঁটা রয়েছে 'প্রেস'। সেটা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত। সেখানে বিশ্ববার্তার অনিল নন্দীকেও দেখা গেল।

ফটোগ্রাফারের দল 'ফ্ল্যাশ' জ্বেলে ছবি তুলছে। কে একটা মুভী-ক্যামেরাও এদিকে ওদিকে নিশানা করছে। এমন বিপুল সম্মান, সমাদর, এত অজস্র গুণকীর্তন। এতে কে না খুশি হয়? কিন্তু শান্তনুর মনে এ কিসের আলোড়ন? একী সুখের আবেশ? না, ব্যথার অসাড়তা? সে নিজেই জানে না।

সব শেষে টীমের সহ-খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে উঠল ক্যাপ্টেন। শান্তনুর ক্রীড়া নৈপুণ্যের প্রচুর সুখ্যাতি করে বলল, অধিনায়ক হিসাবে সে নিজে সর্বদাই শান্তনুর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের উপরে নির্ভর করে। শান্তনুই যে দলের স্তম্ভস্বরূপ সে কথাটাই সে নানা ভাবে ব্যক্ত করতে লাগল।

শান্তনুর হল কী? তার কানের ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে কেন? অসহ্য গরম লাগছে কেন? পাখাটা কি ঘুরছে না?

শান্তনু নিজের আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল। প্যাভিলিয়নে অতিথি অভ্যাগত ও ক্রীড়ামোদীদের ভীড়, তিল ধারণের জায়গা নেই। বহু পরিচিত মুখ। অদূরে মধুদা বসে আছেন ক্লাবের কর্মকর্তাদের মধ্যে। তাঁর মুখ গভীর আত্মপ্রসাদের হাসিতে উজ্জ্বল, বাৎসল্যের দ্যুতিতে প্রশান্ত।

ক্যাপ্টেনের ভাষণ তখনও শেষ হয় নি। হঠাৎ শান্তনু স্প্রিং-এর মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। নিজের গলার মালাটা টান মেরে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুদা'র সামনে। তাঁর গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে সভা থেকে দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

ঘটনাটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অতর্কিত। এক নিমেষে কোথায় কী যেন গুলিয়ে গেল। বলের আঘাতে শান্তনুর মাথার ভিতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না তো? তারই ফলে কী তার সাময়িক মস্তিষ্ক বিকার? কে জানে?

নিউহাভেন থেকে ডিয়েপ। ব্রিটেন থেকে ফ্রান্সে আগমন ও নির্গমনের পথ। পথ অর্থে জলপথ। জাহাজে পারাপারের ব্যবস্থা। সে-জাহাজ পি-এ্যাণ্ড-ও অথবা লয়েড ট্রিস্টীনোর লাইনার নয়, তার পকেট সংস্করণ। শেভ ইম্পালার কাছে যেমন বেবীঅস্টিন, ইভিনিং গাউনের পাশে যেমন মিনি স্কার্ট।

শুধু আকারে ছোট নয়, আরাম আয়েশের আয়োজনও অল্প। আসনের চাইতে আরোহীর সংখ্যা সব সময়েই বেশী। তাই হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল বা শিয়ালদা' থেকে সোনারপুরের লোক্যাল ট্রেনের মতো বেশীর ভাগ যাত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাটাই নিয়ম, বসাটা নিপাতন।

স্কুলপাঠ্য ম্যাপের বই-এ ইংলিশ চ্যানেলকে দেখায় এতটুকু। প্রশান্ত বা ভূমধ্যসাগরের পাশে গোষ্পদতুল্য। কিন্তু আকাশ যেদিন মেঘমেদুর এবং বাতাস যখন খরবেগ তখন এই ক্ষুদে সমুদ্রের প্রতাপও দোর্দণ্ড। ছোট ছোট জাহাজকে প্রায় টুইস্ট নাচন নাচিয়ে ছাড়ে।

আমি পুরোপুরি শহুরে জীব। শ্যামবাজারের ছোট গলিতে জন্ম, হাতিবাগানে বাস। ট্রামে চেপে স্কুলে গিয়েছি, ট্রেনে চেপে গিরিডি বা দেওঘর। কলতলায় চৌবাচ্চার বাইরে জলাশয় বলতে জেনেছি হেদো, গোলদীঘি কিংবা বালিগঞ্জের লেক। ব্যালার্ডপীয়ারে জাহাজে পা দিয়ে প্রথম উপলব্ধি করলাম, পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল। ভূগোলে নেহাৎ মিথ্যা লেখে নি।

বোম্বে থেকে এডেন বন্দরের দূরত্ব বেশী নয়। কিন্তু সেখানে পৌছুবার আগেই টের পেয়েছি প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করেছিলেন সেটা অকারণে নয়। মুনিঋষিরা যোগসিদ্ধ পুরুষ, তাঁদের অসাধ্য কিছু নেই। এক চুমুকে সমুদ্র শুষে নিতে পারতেন, শুনেছি। কিন্তু সমুদ্র-পীড়া ঠেকাতে পারতেন এমন কথা শুনি নি। আয়ুর্বেদে বহু ওষুধ এবং অনেক অনুপান আছে; সী-সিকনেসের প্রতিবেধক নেই।

মোট কথা, স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, জাহাজে চাপলেই আমার মাথা ঘোরে, গা গুলোয় এবং উদরস্থ সমুদয় তরল এবং অতরল পদার্থ একযোগে দ্রুতবেগে ঘন ঘন উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। এসব জেনে শুনেও কেন যে য়ুরোপের পথে জাহাজের টিকেট কিনেছি সে প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই বিলাতের মধ্যবিত্ত ভারতীয় ছাত্রদের অজানা নয়। দেশ থেকে বাবা মাসে মাসে যে-টাকা পাঠান তা দিয়ে কলেজের মাইনে ও ল্যাণ্ডলেডীর সাপ্তাহিক বিল চুকিয়ে অবশিষ্ট সামান্যই থাকে। সে অঙ্কটা ভদ্র সমাজে উল্লেখযোগ্য নয়। চার বছর লণ্ডনে কাটিয়ে এ-কথাটা ভালো করেই বুঝেছি যে, তরুণ বয়সে সাধ এবং সাধ্যের মাঝখানে আছে এক বিরাট গহ্বর। যে-পরিমাণ ট্র্যাভেলার্স চেক দিয়ে তা পূর্ণ করা যায় সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ভারতীয় ছাত্রের কাছে সেটা সহজলভ্য নয়।

অর্থনীতির এসব দুরূহ তত্ত্বচিন্তায় বাধা পড়ল। পুরুষকণ্ঠের প্রশ্ন কানে এল,—"কেয়ার ফর এ স্মোক ?"

এতক্ষণ জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়ে তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের পানে তাকিয়ে ছিলাম। চোখ ফিরিয়ে দেখি, পাশে দীর্ঘায়ত এক পুরুষ। মাথায় প্রায় ছ'ফুট। বিশাল দুই বাহু, বলিষ্ঠ গড়ন। কাঁচায়-পাকায় মেশানো পুরু একজোড়া গোঁফ, তার উদ্ধত প্রান্ত-দুটিতে বেপরোয়া ভাব। মনে হয় যৌবনে অনায়াসেই সার্কাসের দলে বা বক্সিং রিং-এ পসার জমাতে পারতেন। পরিধানে ওরস্টেডের গ্রে ব্যাগস্, গায়ে হ্যারিস্ টুইডের জ্যাকেট। উচ্চারণ শুনে সংশয়ের অবকাশ থাকে না—ভদ্রলোক ইংরেজ।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। অভিনবও বটে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপে পরিচিত ব্যক্তিকেও সিগারেট 'অফার' করার রীতিটা উঠে গেছে। চেনা শোনা দূরে থাক, আগে যাকে চোখে দেখেছি বলেও স্মরণ হয় না তিনি ফস্ করে সিগারেটের কেস্ এগিয়ে দিয়ে বলছেন, "আসুন ধূমপানে আজ্ঞা হোক।" এমন অমায়িকতা কল্পনা করা কঠিন।

"নো থ্যাঙ্কস্। আমি ধূমপায়ী নই।" সবিনয়ে প্রত্যাখান করলাম।

ভদ্রলোক নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী

ছাড়লেন। তারপর কিছুটা স্বগতোক্তির মতো মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, "ইণ্ডিয়ান ইয়োগী, আই সাপোজ ?"

প্রশ্নকর্তার গলার স্বরে এবং চোখের কোণে পরিহাসের আভাসটুকু আমার দৃষ্টি এড়াল না। অন্য সময়ে একটা উপযুক্ত রূঢ় জবাবও দিতাম। কিন্তু কিছুটা বিস্ময় কিছুটা কৌতূহলের বশেই হাস্যতরল কণ্ঠে বললাম, "ভারতীয় বটে, তবে যোগী সন্ন্যাসী নই। হাত গুণে আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারব না।"

ভদ্রলোক দমবার পাত্র নন। "কুড়ি বাইশ বছরের সুস্থ সবল বেটাছেলে, সিগারেট ধরো নি, যোগী নয়তো কী ? ওতে তো এখন মেয়েরাও অভ্যস্ত।" বলে হাসতে লাগলেন।

বোঝা গেল, ভদ্রলোক সরল স্বভাব। ঠাট্টা করাই উদ্দেশ্য, আঘাত করা নয়। সুতরাং আমার মনেও আর বিরূপতার লেশ রইল না। সহাস্যে জবাব দিলাম, "সে-কারণেই ছেলেদের পক্ষে এখন ওটা বর্জনীয়। ফ্লারটিং এবং অর্কিডের মতো সিগারেটটাও এখন মেয়েদের জন্যেই তোলা থাক। আমরা আধুনিক তরুণেরা তাতে ভাগ বসাতে চাই নে।"

উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক। বললেন, "সাবাশ। একেই তো বলে পৌরুষ। সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও পাইপের ভক্ত; সিগারেট চলে শুধু কালে ভদ্রে। বিশেষত বিদেশে বিভুঁইএ। পকেটে রাখা সহজ, পথে-ঘাটে পেতেও কষ্ট নেই।"

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলেন, "য়ুনিভার্সিটির ছুটিতে কন্টিনেন্টে বেড়াতে যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, তবে আমার দৌড় ফ্রান্স অবধি। বিদেশ-বাসের দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই দেশে ফেরার আগে একবার অন্তত প্যারিসটা দেখে নিতে চাই।" আমি জবাব দিলাম।

"দেশে মানে বাংলা দেশ তো ? তোমাদের স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যার নাম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ?"

বিস্মিত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "আমি যে বাঙ্গালী, চিনলেন কেমন করে ? কপালে তো কিছু ছাপ মারা নেই।"

মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "মাথায় বড়, বছরে ছোট বাঙ্গালী সন্তান। চেহারা ও চলন-বলন দেখে যদি না চিনতে পারব তবে বৃথাই কাল কাটিয়েছি সেখানে।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। ইংরেজ স্বভাবতই অমিশুক যার ইংরেজী নাম ইনসুলার। কেউ যথারীতি পরিচয় করিয়ে না দিলে গায়ে পড়ে কথা বলার পাত্র সে নয়, ভাব করা দূরে থাক। কিন্তু সুয়েজ পার হলেই তার মানসিক জাতিচ্যুতি ঘটে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলতে ভারতবর্ষে আমরা জানি বর্ণসংকর একটা বিশেষ সম্প্রদায়। বৃটেনে ভারতপ্রত্যাগত ইংরেজ মাত্রেরই ঐ পরিচয়। আচার, আচরণ, রুচি ও মনোভাবে তারা পৃথক। স্বজাতির সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাদের সাদৃশ্য নেই। তাদের পক্ষে বিদেশীর সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টাটা অভাবনীয় নয়।

আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাংলা দেশে ছিলেন বুঝি? তাই বলুন। কোথায় ছিলেন? কতদিন?"

"কোথায় ছিলাম তা না বলে কোথায় ছিলাম না তা বলা সহজ। রংপুরের গ্রামে ক্যাম্পে থেকে সেটলমেণ্টের জরিপ করেছি। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ, বাখরগঞ্জে বন্যাত্রাণ। মৈমনসিং-এ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আর হুগলীতে চটকলে ধর্মঘটের ফলে না ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছি কতদিন। কলকাতার ময়দানে খেলেছি রাগার, ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট। তখন বাংলাদেশ দু'ভাগ হয় নি। সে-সময়ে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া যেতে ভিসা লাগত না।" বলে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক।

"আপনি কি···", প্রশ্নটা শেষ করার আগেই ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "ঠিকই আঁচ করেছ। সাবডিভিসন্যাল অফিসার হয়ে শুরু, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার হয়ে শেষ। তার আগে অবশ্য চার বছর কেটেছিল নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ারে।"

অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজপুরুষের প্রতি আমার মনে একটা গভীর বিতৃষ্ণা আছে। সেটা তাঁদের অতীত শাসনের কথা মনে করে নয়। তাঁদের বর্তমান প্রচ্ছন্ন পিঠচাপড়ানো মনোভাব—ইংরেজীতে যাকে বলে

পেট্রোনাইজিং এ্যাটিচ্যুড-এর জন্য। এদেশে ভারতীয় কারো সঙ্গে আলাপ হলেই তাঁরা বলতে শুরু করেন, নেহেরু একজন গ্রেটম্যান, ভারতবর্ষের উন্নতি দেখে তাঁরা অভিভূত, কিংবা ঐ ধরনের মুরুব্বি চালের ছক বাঁধা নানাবিধ মিথ্যা স্তুতি যা শুনলেই গা জ্বালা করে।

"এক্সকিউজ মী" বলে আলাপ আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়ে জাহাজের অন্য প্রান্তে চলে যাব ভাবছিলাম। কিন্তু জানি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা শুয়ে বসে থাকলেই সী-সিকনেসটা জঁাকিয়ে বসে। বরং কথাবার্তায় সময় কাটালে অনেক উপশম ঘটে। সুতরাং কথার জের টেনে বললাম, "আপনার কর্মক্ষেত্রের পরিধিটা তো বড় কম ছিল না। আদিতে নর্থ-ওয়েষ্ট, অন্তে নর্থ-ইষ্ট। দেশের পশ্চিম সীমান্ত থেকে একেবারে পূর্ব প্রান্তে।"

"শুধু আয়তনেই অসাধারণ নয়, অভিজ্ঞতায়ও। ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের অংশটুকু তো রোমাঞ্চকর। শুনবে সে কাহিনী?"

প্রশ্নটা নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি যে আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখেন এমন মনে হল না। কিন্তু নিজের হাত-ঘড়িটার উপর চোখ পড়তেই বললেন, "ইস্, দেড়টা বেজে গেছে দেখছি। তোমার খাওয়া হয়েছে কি? তা হলে চল, লেটস্ গো ফর এ বাইট।"

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিলেন। বললেন, "না, না, আমি কি ডাইনিং সেলুনে এক গিনির লাঞ্চ খাওয়ার কথা বলছি? পাগল? পেন্সনের টাকায় ও সব বাবুগিরি চলে কখনও? চা কিংবা কফির সঙ্গে যা হোক সামান্য কিছু জুটলেই খুশি।"

মনে মনে ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা করলাম। আমি না বললেও আমার পকেটের বিশীর্ণ অবস্থাটা সঠিক অনুমান করেছেন। পাছে আমার পক্ষে কুণ্ঠার কোন কারণ ঘটে সে জন্য নিজের কল্পিত অর্থকষ্টের দোহাই দিয়ে আমার দৈন্যকে ঢেকে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

ভাগ্য ভালো, জাহাজের স্ন্যাক-বারে এক কোণে কয়েকটা চেয়ার খালি ছিল। দু'পেয়ালা কফি ও কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে দু'জনে তারই দু'টো দখল করলাম। মুখোমুখি বসে শোনা গেল ভূতপূর্ব ইংরেজ

শাসকের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার ইতিহাস,—মিস্টার জন পার্সিভেল ফেয়ারওয়েদার, সি-আই-ই, আই-সি-এস (রিটায়ার্ড)-এর অলিখিত অটোবায়োগ্রাফী।

ফেয়ার ওয়েদারের বংশে কোন এক পূর্বপুরুষ ছিলেন জাতিতে আইরিশ। বোধ হয় সিনফিনদের রক্তের ধারা ছিল তাঁর ধমনীতে। ছোটবেলা থেকেই দুঃসাহসিকতায় তাঁর আগ্রহ, দুর্গম ও দুঃসাধ্যের প্রতি আকর্ষণ।

মনে পড়ে, স্কুলের সামনের রাস্তায় একদিন একটা ল্যাণ্ডো গাড়ির ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে এলোপাতাড়ি ছুটছিল। কোচোয়ান ছিটকে পড়ে গিয়েছিল পথের একপাশে। গাড়ির ভিতরে ভীতসন্ত্রস্ত গুটিতিনেক অসহায় মহিলা আর্তস্বরে চিৎকার করছে। পথচারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

বালক ফেয়ারওয়েদার ক্লাশে একটা কাঠের রুলার দিয়ে খাতায় লাইন টানছিল। মুহূর্তের মধ্যে পথে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াটার সামনে হাতের রুলার উঁচিয়ে দাঁড়াল। চারিদিক থেকে "গেল, গেল" শঙ্কিত রব উঠল ;—এক্ষুণি উন্মত্ত ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে গুঁড়ো হয়ে যাবে এক রত্তি ছেলেটা।

একী আশ্চর্য ঘটনা! মাস্টার, সহপাঠী, পথের লোকজন সবাই দেখে অবাক, ঘোড়াটা আচমকা বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

বড় হয়ে কলেজ জীবনে বাজি রেখে হোস্টেলের ছাদ থেকে লাফিয়েছেন। পাড়ার গুণ্ডার দলকে হকী স্টীক দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে শায়েস্তা করেছেন। আজও কপালে, বাহুতে একাধিক কাটার দাগে আছে যৌবনের সে-সব অসমসাহসিক কীর্তিকলাপের অলুপ্ত স্বাক্ষর. বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত, তাঁর ফেয়ারওয়েদার নামটায় প্রপার নাউনের প্রপার প্রয়োগ হয় নি। বাস্তবিক, তাঁকে যাঁরা ভালো করে জানেন, ডেয়ার-ডেভিল কথাটার মানে বুঝতে তাঁদের কষ্ট হয় না।

পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় তাঁর নাম তালিকার অনেক উঁচুতে ছিল। অনায়াসেই হোম সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে স্বদেশে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন ভারত সরকারের

চাকরি। ফ্রন্টিয়ার ক্যাডারে। সেখানে না আছে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী শহরের মতো কোন প্রবাসী বেসরকারী ব্রিটিশ সম্প্রদায় বা সমাজ। না পাওয়া যায় য়ুরোপীয় জীবনযাত্রার যথেষ্ট উপকরণ। স্থানীয় জনসাধারণ একটু বিশেষ ধরণের। তারা আবেদন নিবেদনে অভ্যস্ত নয়, হরতাল, পিকেটিং-এর ধার ধারে না। কথায় কথায় খুনোখুনি, রক্তারক্তি ঘটে। কলম চালনার চেয়ে গুলীচালনায় তাদের পারদশিতা বেশী।

সীমান্ত প্রদেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানের শাসন পদ্ধতিরও মিল নেই। প্রদেশের যে অংশটার নাম 'বিধিবদ্ধ এলাকা' অর্থাৎ 'সেটেলড ডিস্ট্রিক্টস্' সেখানকার আইন কানুন যদি বা মোটামুটি একই রকম, হিন্দুকুশ পর্বতের গা ঘেঁষে আফগানিস্থানের সীমানা অবধি যে উপজাতীয় অঞ্চল তার ব্যবস্থা আলাদা। ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ধারা সেখানে সামান্যই পৌঁছয়। সংক্ষেপে, কখনও কামান কখনও বা কাঞ্চন—এ দুই বস্তুর উপরে নির্ভর করে সেখানকার রাজ্যশাসন চালাতে হয়।

যে-বছর ফেয়ারওয়েদার পেশোয়ারে তাঁর কাজে যোগ দিলেন তার কিছুদিন আগে থেকেই উপজাতীয় একটা বিদ্রোহী দলের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ চলছিল। এ কিছু অভাবিত ঘটনা নয়। যদিও কাগজেকলমে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তৃতি ডুরাণ্ড লাইন পর্যন্ত স্বীকৃত, সীমান্তের উপজাতীয়েরা গভর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব সম্পূর্ণ মেনে নেয় নি। সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে ছোট বড় সংঘর্ষ বেধে যায়। কয়েকদিন গুলী-গোলা অথবা টাকা অথবা উভয় বৃষ্টির পর আবার থেমেও যায়। গোড়াতে বর্তমান বিদ্রোহকেও মনে হয়েছিল ঐ-জাতীয় একটা সাময়িক উৎপাত। কিন্তু সে-ভুল ভাঙ্গতে দেরী হলো না। ক্রমশঃই ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠল।

বিদ্রোহী দলের মালেক অর্থাৎ প্রধানকে সবাই বলে সুপীনের ফকির। রবীনহুড, আনন্দমঠ ও নানাসাহেবের কাহিনী একসঙ্গে জুড়লে যা পাওয়া যায় সুপীনের ফকির তাই। লোকটা দীন-দরিদ্রের বন্ধু, ধর্মপরায়ণ,

ব্রিটিশবিদ্বেষী অথচ খুন, লুঠতরাজ ও যুদ্ধবিগ্রহে তার জুড়ি নেই। তার সংগঠন ক্ষমতা অসাধারণ।

বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে একটা ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছে বললেই হয়। সেখানে তার হুকুমে অধিবাসীরা ওঠে বসে, তার ফরমানে অপরাধীদের বিচার হয়, জুম্মার জমায়েতে তার ওয়াজ শুনতে হাজার লোকের ভীড় জমে। তু'দিকে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে ডাকা থেকে পেশোয়ারের মধ্যে যে ব্যবসায়ীরা সওদা নিয়ে আসা-যাওয়া করে তারা কেউ সুপীনের ফকিরকে সেলাম এবং সেলামী না দিয়ে পার পায় না।

বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে বাছা একদল খাসাদার সঙ্গে নিয়ে এক ব্রিগেডিয়ার রওনা হয়েছিলেন সুপীনের দিকে। মাঝপথে পাহাড়ের আড়াল থেকে অতর্কিতে সদলে হানা দিল ফকির। ব্রিগেডিয়ার আর তার খাসাদার বাহিনীর খবর পৌঁছে দেবে গভর্ণমেণ্টের কাছে এমন কারো চিহ্ন রইল না কোনোখানে।

দ্বিতীয় অভিযানের যিনি নায়ক তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে লক্ষ্যস্থলে যদিবা পৌঁছলেন যুদ্ধ করার সময় পেলেন না। জীরগার সভা ডেকেছিলেন। হুজরার চত্বরে ঘোড়ার পিঠে থেকে নামার সময় অলক্ষিতে গুলী এসে বিঁধল তাঁর কপালে। ডাক্তার বদ্যি ডাকার ফুরসৎ ছিল না।

অবশেষে বিদ্রোহ দমনের ভার নিয়ে এলেন প্রধান ও সুদক্ষ শাসক লেনসট্ হুইলার। যৌবনে অনেক দিন সীমান্ত প্রদেশে কাজ করেছেন। উপজাতীয়দের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁর নখদুর্পণে। রণনীতির চাইতে কূটনীতিতে তাঁর বেশী বিশ্বাস। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহীদের দলে বিভেদ সৃষ্টি করলেন। সুপীনের ফকিরের এক প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে দিলেন।

গভর্ণমেণ্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারীর উচ্চপদে প্রমোশন যখন পাকা হয়ে এসেছে তখন এক গভীর নিশীথে ল্যাণ্ডি-কোটালে নিজের শয়নকক্ষে লেনসট্ নিহত হলেন।

বাইরে সশস্ত্র প্রহরী, দরজা জানালা ভিতর থেকে বন্ধ। আত্মহত্যা

নয় তো ? বিছানার পাশে একটা নীল রুমাল পাওয়া গেল। হত্যাকারী কারা সে সম্পর্কে আর সন্দেহ রইল না। সেটা ফকিরের সিলমোহর।

দিল্লীতে সপারিষদ ভাইসরয় চিন্তিত, লণ্ডনে হোয়াইট-হল বিচলিত। এ সঙ্কটময় সময়ে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে একখানা দরখাস্ত পৌঁছল। আপনি যেচে স্নুপীনের বিদ্রোহ দমনের ভার নিতে চায় এক তরুণ আই-সি-এস। দরখাস্তের সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনারের মন্তব্য,—"ছোকরা সার্ভিসে সদ্য ঢুকেছে। সীমান্ত অঞ্চলের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে সাহস আছে বটে।"

বড় কর্তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। পর পর তিনজন অফিসার যেখানে খুন হয়েছে সেখানে আপাতত কাউকে পাঠাতে পারলেই হয়। অভিজ্ঞতা ? সে পরে হবে। তাঁরা টেলিগ্রামে পোস্টিং অর্ডার পাঠালেন।

ল্যাণ্ডিকোটালে লেনসটের চেয়ারে বসেই ফেয়ারওয়েদার বুঝতে পারলেন, উপজাতীয়দের ভাষা না জানলে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বা বৈরিতা কোনোটাই সম্ভব নয়। অনেক সন্ধানে একজন মুন্‌শী পাওয়া গেল। মানুষটি বয়সে প্রবীণ, বুদ্ধিতেও বিচক্ষণ। ছাউনি ও কেল্লার সাহেবদের স্থানীয় ভাষা শেখাতেন, এখন অবসর নিয়েছেন। তিনি প্রত্যহ বাড়ি এসে পস্তু শেখাতে রাজী হলেন।

ছাত্রের শিখবার আগ্রহ দেখে মুন্‌শীর উৎসাহ বাড়ল। শিক্ষকতা তাঁর পেশা ; কিন্তু তিনি পেশাদারী নন। তাঁর আন্তরিকতায় ফেয়ারওয়েদারের মনে শ্রদ্ধা দেখা দিল।

একদিন মুন্‌শী জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর একা মানুষ, ঘরে মেম-সাহেব নেই। আশা করি খানসামা, খিদমদগার, বেয়ারা, বাবুর্চীরা সব কাবল-ই এতমাদ, বিশ্বাসযোগ্য ?"

ফেয়ারওয়েদার অবাক হলেন। পাঠ নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও তিনি মুন্‌শীর সঙ্গে ফসল, আবহাওয়া, তন্দুর ইত্যাদি ঘরোয়া বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। লক্ষ্য করেছেন, বৃদ্ধ প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেন, নিজে কোন প্রসঙ্গ তোলেন না।

"হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?" ফেয়ারওয়েদার জিজ্ঞাসা করলেন।

"বিশেষ কোনো কারণে নয়, একটা পস্তু প্রবাদ মনে এল,—"ঢোলক এবং নৌকর তুই-ই আগে বাজিয়ে নিতে হয়।" মুন্‌শী বললেন।

"আমার চাকর বলতে দু'জন। বাবুর্চী ডিস্যুজা গোয়ানীজ। পেশোয়ারে আমার চাকরিতে ঢুকেছিল। সেই থেকে আছে। দ্বিতীয় দীন মহম্মদ। সে তো দুগ্ধপোষ্য শিশু বললেই চলে। ছেলেটার বাপ-মা আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ কোথাও নেই শুনেছি।" ফেয়ারওয়েদার জানালেন।

মুন্‌শী বললেন, "গরিবের প্রতি হুজুরের জারবানওয়াজি সবাই জানে।"

ফেয়ারওয়েদার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে-বিষয়ে পস্তুতে কোনো প্রবাদ আছে কি?"

মুন্‌শীও হাসলেন। জবাব দিলেন, "আছে। প্রবাদে বলে, পথে কুড়িয়ে পাওয়া বদনায় জল ধরে না, তাতে ফুটো থাকে।"

ফেয়ারওয়েদার ইঙ্গিতটা বুঝলেন। মুখে কিছুই বললেন না। মনে মনে ভাবলেন, বেচারী দীন মহম্মদ। ডিস্যুজা তো তার পিছনে লেগেই আছে। অহর্নিশ কেবলই নালিশ। সে কি করেছে বা কী করে নি তারই সবিস্তারিত ফর্দ। দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধ মুন্‌শী সাহেবও তার প্রতি প্রসন্ন নন।

দীন মহম্মদকে ফেয়ারওয়েদারের খুবই পছন্দ হয়েছে। ছোকরার বয়স অল্প, বারো কিংবা তেরো বছর হবে। ঐটুকু বয়সেই সে কাজে ও বুদ্ধিতে অত্যন্ত হুঁশিয়ার। ডিস্যুজা রান্নাবান্নার কাজটা ভালোই করে, কিন্তু তার মগজে কিছু নেই। আজ পর্যন্তও হ্যাসাগ-ল্যাম্পটা ঠিকমতো জ্বালাতে শেখে নি। দীন মহম্মদ দু'দিনেই তা রপ্ত করেছে। মনিব কখন কোথায় যেতে কোন জামা কাপড় পরবেন, কোন জিনিস সঙ্গে নেবেন সব তার জানা হয়ে গেছে। সাহেবের আপিসের ফাইল, আলমারির বই, কলম, পেন্সিল সে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। ঘুম ভাঙলেই চায়ের পেয়ালা, বাড়ি ফিরলেই বিয়ারের মাগটি হাতের কাছে এগিয়ে ধরে। ফেয়ারওয়েদার বলেন, দীন মহম্মদ তাঁর মাই ম্যান জীভস।

দীন মহম্মদের সব চেয়ে বেশি যত্ন ও মনোযোগ মনিবের মোটর বাইকটার প্রতি। ল্যাণ্ডিকোটালে জিনিসটা তখন নূতন। ফেরারওয়েদার যখন মোটর-বাইক চেপে আপিসে যান তখন রাস্তার শুধু ছেলের দল নয়, বয়স্ক লোকেরাও বিস্ময়ে কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে।

দীন মহম্মদ মোটর-বাইকটাকে দিনে বার বার করে ঝাড়ে, মোছে, পালিশ করে। সাহেব বেরোবার আগে দরজার কাছে এনে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ি ফিরলে তাঁর হাত থেকে নিয়ে ঘরে তুলে রাখে। কোনো কোনো দিন ফেয়ারওয়েদার তাঁর আপিসের আর্দালীর বদলে দীন মহম্মদকে মোটর বাইকের পিছনে পিলিয়নে বসিয়ে বাজারে বা দপ্তরে নিয়ে যান। হর্ষে, গর্বে ও উত্তেজনায় সে-দিন তার যেন মাটিতে আর পা পড়ে না।

মুস্কিল এই যে, ডিস্যুজার আপত্তি ঠিক ঐখানে। দীন মহম্মদ যে মোটর-বাইকের তদারক করে এটা তার মোটেই মনঃপূত নয়। সুযোগ পেলেই সে তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সাহেব যে ঐ পুচকে ছোঁড়াটাকে ফট্‌ফটিয়ায় হাত দিতে দিচ্ছেন তার ফল ভালো হবে না। হতভাগা একদিন জিনিসটা ভেঙেচুরে রাখবে। তখন যেন কেউ তাকে অর্থাৎ ডিস্যুজাকে দোষ না দেয় যে, সে আগের ভাগে সাবধান করে নি।

ডিস্যুজার মনোভাবটা বোঝা যায়। সে সাহেবের পেশোয়ারের আমলের ভৃত্য। সাহেবের জিনিসপত্রের উপরে কর্তৃত্ব তো তারই। অন্য আর কেউ, বিশেষ করে এই ক্ষুদ্র বালক যে তাতে ভাগ বসায় সে তার ইচ্ছা নয়। ফেয়ারওয়েদার মনে মনে হাসেন।

যে-কাজে তাঁর পূর্ববর্তীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, সে কাজে ফেয়ারওয়েদার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন। দমননীতি সফল হয় না? সে-কথা বলে শুধু তারা সে-নীতি চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করার হিম্মত নেই যাদের।

ফেয়ারওয়েদার বলেন, দোমনা-নীতি বিফল হয়, দমন-নীতি নয়। কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লা থেকে নির্মূল করলেন। উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। কী উপায়ে তা বিস্তারিত বলতে গেলে সময় লাগবে প্রচুর, শোনার ধৈর্যও থাকবে না অনেকেরেই।

নির্মম নিষ্ঠুর হতে হয়েছে, অনেক নিরপরাধ স্ত্রী পুরুষ পাইকারি হারে শাস্তি পেয়েছে, সে-কথাও অস্বীকার করেন না। কিন্তু নাচতে নামলে তো ঘোমটা টানা চলে না। যেমন রোগ তেমনি তার চিকিৎসা। নাক্স-থার্টি খাইয়ে কি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস সারানো যায়? তার জন্য সার্জেনের ছুরি চালাতে হয়।

বিদ্রোহীদের অনেকে ধরা পড়ল, অনেকে বা ধরা দিল। কিন্তু সুপীনের ফকীরের কেউ নাগাল পেল না। সে তার অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত জনকয়েক অনুচরসহ পাহাড়ে, জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াল। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে আচমকা হানা দিতেও ছাড়ল না।

সীমান্ত সংঘর্ষ প্রায় মিটল কিন্তু ফেয়ারওয়েদারের ঘরে দ্বন্দ্ব থামল না। একদিন অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ডিসুজা এসে নালিশ করল, দীন মহম্মদ সাহেবের অনুপস্থিতিতে লুকিয়ে মোটর-বাইক চড়ার চেষ্টা করেছে।

অসম্ভব! মোটর-বাইক যেন সাধারণ সাইকেল, ঘণ্টা কয়েক ঠেলে ঠুলে, আছাড় খেয়ে শেখা যায়? ইঞ্জিনের ব্যাপার, তা চালাবার সংকেত জানতে হবে না? হিংসায় ডিসুজার কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়েছে কি? ফেয়ারওয়েদার তাকে নিজের কাজে মন দিতে বললেন।

মুনশী পাশেই বসেছিলেন। তাঁর পানে তাকিয়ে সহাস্যে শুধালেন, "মুন্‌শীজী, এ সম্পর্কে পস্তু প্রবাদ কী বলে?"

প্রত্যুত্তরে মুন্‌শী হাসলেন না। সবিনয়ে বললেন, "হুজুর, দানীশমান্দ, বিজ্ঞ লোক। সব কিতাবের খবর রাখি আমার এমন ইলেম কোথায়? তবে চলতি একটা কথা আছে,—দুনিয়ায় ঘটনার সীমা নেই: সীমা আছে শুধু ধারণার।"

মাস খানেক পরের ঘটনা। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে ফেয়ারওয়েদারের ঘুম ভেঙে গেল। কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

এই বাংলোয় এই ঘরে এই খাটে ঘুমের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন লেনস্ট হুইলার। ফেয়ারওয়েদার বালিশের নীচে থেকে গুলীভরা

পিস্তলটা হাতে নিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। সাবধানে জানালাটা একটুখানি খুলে দেখলেন। আকাশে চাঁদের আলো স্তিমিতপ্রায়। আবছা অন্ধকারে মনে হল, কী একটা জন্তু বাংলোর বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে গেল।

নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এলেন। খানিকটা এগুতেই বুঝলেন, দূর থেকে যেটা জন্তু মনে হয়েছিল, সেটা তার নিজের মোটর-বাইক। দীন মহম্মদ ভু'হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাবে কোথায়? সদর দরজায় বন্দুকধারী সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে।

দীন মহম্মদ সদর দেউড়ির দিকে গেল না। বাড়ির পিছন ভাগে আখরোট গাছটার আড়ালে দেওয়ালে একটা ছোট দরজা আছে। কখনও ব্যবহার হয় না, তালাবন্ধ থাকে। দীন মহম্মদ পকেট থেকে চাবি বের করে ধীরে ধীরে তালা খুলল। সন্তর্পণে মোটর-বাইকটা নিয়ে রাস্তায় নামল। তারপর পিছনের দরজাটা আলগোছে টেনে ভেজিয়ে দিল। বিস্মিত ফেয়ারওয়েদার তার পিছু নিলেন।

নিঝুম নিশুতি রাত্রি। পথে জনপ্রাণী নেই। দীন মহম্মদ মোটর-বাইকটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ছাউনির প্রায় শেষ প্রান্তে রাস্তা যেখানে চৌমাথায় মিলেছে সেখানে এসে সে এক মিনিট থামল। তারপর ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে প্যাডেলে সজোরে আঘাত করতেই মোটর-বাইকের ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে গর্জন করে উঠল। দীন মহম্মদ অবলীলাক্রমে সিটের উপর চেপে বসল, সুদক্ষ চালকের মত তীরবেগে চালিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। বোঝা গেল, নৈশ অভিযানটা আজই প্রথম নয়। অনেক দিন থেকেই সে মোটর-বাইক চালনা অভ্যাস করেছে।

ফেয়ারওয়েদার স্তব্ধ বিস্ময়ে ধীরে ধীরে বাংলোয় ফিরে এলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে যেমন নিঃশব্দে, যে-পথ দিয়ে দীন মহম্মদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, তেমনিভাবে ঠিক সে-পথেই সে বাড়ি ফিরে এল। সাবধানে মোটর বাইকটি ঘরে তুলে রাখল। তারই পাশে নিজের

খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নিজের ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে তার মনিব যে নির্বাক বিস্ময়ে তার গোপন নৈশবিহারের সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছেন, সে-কথা সে জানতে পারল না।

পরদিন সকালে দীন মহম্মদের প্রাত্যহিক কাজে কোথাও কোনো খুঁত ছিল না। বাথ-রুমে সাহেবের স্নানের গরম জল টাব-ভর্তি। আলনায় ইস্তিরি-করা আপিসের পোশাক। জুতোজোড়া পালিশে চক্‌চকে। ফাউন্টেন পেন, পার্স; নোটবই, তামাকের পাইপ ও পাউচ—যা যা প্রয়োজন সবই টেবিলের উপরে পরিপাটি সাজানো। বারান্দায় মোটর বাইকটি ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার, তার কোথাও এক কণা ধুলোর চিহ্ন নেই।

"কাল রাত্রিতে কোথায় গিয়েছিলে?" ফেয়ারওয়েদার গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

দীন মহম্মদ প্রথমে চমকে উঠল। তারপর মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কবে থেকে লুকিয়ে আমার মোটর-বাইক চড়ে বেড়াচ্ছ? মুখে কথা নেই যে? জবাব দাও।" ক্রুদ্ধ মনিব দাবী করলেন।

দীন মহম্মদ নিরুত্তর।

"আমি বেয়াদপ পুষি নে। পাজি, হতচ্ছাড়া, তোমার নোকরি খতম। আজই চলে যাবে এখান থেকে।" কঠিন স্বরে আদেশ দিয়ে ফেয়ারওয়েদার আপিসে চলে গেলেন।

বিকেলে বাড়ি ফিরে ডিসুজার কাছে শুনলেন, দীন মহম্মদ চলে গেছে। কোথায় তা ডিসুজা জানে না। তার একান্ত নিজস্ব যে সম্পত্তি নিয়ে প্রথমে সে এ-বাড়িতে ঢুকেছিল—গোটা-দুই সালোয়ার, একজোড়া চপ্পল, একটা পিরান, ছোট একখানা আর্শি, কাঠের ছোট চিরুনি—এ-রকম আর দু'একটা ছোটখাটো জিনিস—তাছাড়া দীন মহম্মদ সঙ্গে কিছুই নিয়ে যায় নি। সাহেবের দেওয়া উর্দি, পিতলের বোতাম বসানো জীনের কোট, পশমের গলাবন্ধ, এমন কি নিকেলের চেনবাঁধা হুইসিল বাঁশিটি পর্যন্ত ফেলে রেখে গেছে।

ফেয়ারওয়েদারের মনটা খারাপ হল। ছেলেটা অনেকদিন ছিল। তার উপর একটা মায়া বসে গিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলা মুন্‌শী আসতেই তাঁকে ঘটনাটা বললেন। মুন্‌শীর চোখে মুখে কোনো ভাবান্তরের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি যে কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিস্মিত হয়েছেন এমন মনে হল না। শান্ত কণ্ঠে বললেন, "হুজুর, স্ত্রীলোক এবং বালক দুই-ই সরল। কিন্তু প্রলোভনে পড়ে একবার যদি পা পিছলোয় তবে তাদের হঠকারিতার সীমা থাকে না।"

হুজুর মৃদু হেসে তাঁর মুখের পানে তাকাতেই মুন্‌শী তাড়াতাড়ি বললেন, "না সাহেব. এ কোনো প্রবাদ বা পুঁথির কথা নয়, এ আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা।"

সেদিন ছাত্র বা শিক্ষক কারুরই পড়া বা পড়ানোতে মন বসল না। মুন্‌শী যখন বিদায় নিতে উঠলেন তখন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "গোস্তাখি মাফ হয়, শুনেছিলাম হুজুর দু'বছরের জন্য এখানকার কর্তা হয়ে এসেছিলেন। আপনি পেশোয়ারে ফিরে যাবেন কবে?"

"আমার টেনিওর অর্থাৎ এখানকার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এবার গেলেই হয়।" ফেয়ারওয়েদার ঔদাসীন্যের স্বরে জবাব দিলেন। তিনি যে কাজের ভার নিয়ে ল্যাণ্ডিকোটালে এসেছিলেন, তা সম্পন্ন করেছেন। উপরওয়ালারা খুব খুশি। ছোটখাটো সাময়িক উপদ্রব সীমান্ত সরকারের গা-সহা। ফকীরের দু'চারটে একক বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত। সুতরাং তিনি এখানকার আধা-সামরিক কার্যভার ছেড়ে যে-কোন দিন জয়গৌরবে অনায়াসে ফিরে যেতে পারেন নিজের বেসামরিক সার্ভিসে। ডেপুটি কমিশনার হয়ে বসতে পারেন নিরাপদ নিরুপদ্রব জেলায়। কিন্তু সুপীনের ফকীরকে ধরতে পারেন নি, তাঁর মনে সে খেদ ছিল। পুরাপুরি সাফল্যের তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না।

এ তথ্য মুন্‌শী অনুমান করেছিলেন কি না জানার উপায় ছিল না। তিনি সামনে ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে বললেন, "খোদা হাফীজ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" হাতের ডিজ লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

পরদিন থেকে মুন্‌শীর আর দেখা পাওয়া গেল না। ইতিপূর্বে কখনও তাঁর কাজে কামাই হয় নি। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টায় ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ডান হাতে একটি লাঠি ও বাঁ হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে এসে হাজির হতেন।

ফেয়ারওয়েদার প্রথমে ভাবলেন, বোধ হয় অসুখ করেছে। দিন সাতেক পরে খবর পাওয়া গেল, মুন্‌শী তাঁর গাঁয়ে চলে গেছেন। কবে ফিরবেন, কেউ জানে না।

জামরুদ থেকে আফগান সীমান্তে লাণ্ডিখানা অবধি যে-রেল চলে, একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে ফকীর তারই উপরে চড়াও হলো। প্যাসেঞ্জারদের টাকাকড়ি, সরকারের রসদপত্র কেড়ে নিয়ে গেল।

ফেয়ারওয়েদারের জেদ বেড়ে গেল। যে করেই হোক ফকীরকে শেষ না করে তিনি নড়বেন না। তাঁর সন্দেহ হল আশেপাশের পাহাড়ে, অরণ্যে লুকিয়ে থাকলেও সে হামেশাই লোকালয়ে যাতায়াত করে। কেউ তাকে গভর্ণমেণ্টের হাতে ধরিয়ে দেয় না। হয়তো ভয়ে নয়তো ভক্তিতে। তাকে জীবিত বন্দী করার আশা দুরাশা মাত্র। অন্য পন্থা ধরতে হয়।

পেশোয়ারের ক্লাবে লণ্ডন টাইমস আসে। ল্যাণ্ডিকোটালের অফিসারেরা তা পড়তে পায়। সেদিন রাত্রিতে ডিনারের শেষে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। ডিসুজা এসে সংবাদ দিল, দুপুরে দীন মহম্মদ এসেছিল।

দীন মহম্মদকে তাড়িয়ে দিয়ে ফেয়ারওয়েদার নিজেই অনুতপ্ত ছিলেন। আহা, ছেলেমানুষ, মোটর-বাইক চড়বার লোভ সামলাতে পারে নি। সেজন্য এতখানি কঠোর দণ্ড না দিলেও চলত। বেয়ারা অবশ্য নূতন একজন রাখা হয়েছে, কাজও আটকে নেই। কিন্তু তার মত না বলতেই কী চাই তা আঁচ করে হাতের কাছে জিনিসটি আগের ভাগে এগিয়ে দেওয়ার মত ক্ষমতা কারো নেই। দীন মহম্মদের অভাব ফেয়ারওয়েদার প্রতিদিনই অনুভব করেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দীন মহম্মদ চলে যাওয়াতে ডিসুজাও সুখী

নয়। ছোকরা বজ্জাতি একটু করত সন্দেহ নেই। সহবৎও শেখে নি। মানী লোকের অর্থাৎ ডিসুজার মানমর্যাদা কি করে রাখতে হয় তাও জানে না। তা মাঝে মাঝে দু'চারটে চড়চাপড় বা দু'এক ঘা চাবুক কষিয়ে দিলেই হতো। একেবারে বরখাস্ত করে বাড়ির বার করে দেওয়া কেন? সাহেবের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

বাড়িতে গৃহিণী নেই। অকৃতদার মনিব দিনের বেশির ভাগ সময়টাই থাকেন আপিসে বা শহরের বাইরে কাজেকর্মে ব্যস্ত। সংসারে কাজের চাপ নেই। এমন অবস্থায় অন্তত ঝগড়া করার জন্যও একজন কাউকে কাছে না পেলে ডিসুজার দিন কাটতে চায় না। নতুন বেয়ারাটা একটা আস্ত উজবুক। কি ভাষায় যে কথা বলে সে-ই জানে। ডিসুজা তো তার অর্ধেক বুঝতেই পারে না।

দীর্ঘদিন পরে দীন মহম্মদকে দেখে ডিসুজা সত্যি খুশী হয়েছিল। সে এসেছিল শুনে সাহেবও যে অখুশী নন, তা বোঝা গেল। কী চায় দীন মহম্মদ? ফিরে আসার ইচ্ছা যদি তবে এসে কাজে লেগে যাক। সাহেবের আপত্তি নেই। তবে না বলে-কয়ে মোটরবাইকে যেন হাত না দেয়।

ডিসুজা জানাল, দীন মহম্মদ নোকরি চাইতে আসে নি। এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল, অমনি একবার দেখা করে গেল। হাজার হোক, ছোকরা তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। অনেক গল্প করল। ইনামের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। কথাটা কি সত্যি? সত্যি হলেই বা ইনাম পাবে কে? সুপীনের ফকীর কখন কোথায় থাকে তা কেউ জানতে পারে না। জাদু করতে জানে, ধরতে গেলে চোখের সামনে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায়। তার গায়ে আঁচড়টি কাটা কারো সাধ্য নেই। তা সাহেব যা-ই মনে ভাবুন না কেন।

ইনাম মানে পুরস্কার। ছাউনিতে, আশে পাশের গ্রামে, হাটে, বাজারে, জীরগায় ঢোল-শহরতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে-কেউ ফকীরের জীবিত বা মৃতদেহ এনে হাজির করবে, সে-ই গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। ফকীরের ফটোসহ হাজার

হাজার ইশতাহার ছেপে বিলি করা হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় বড় পোষ্টার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন ফল হয় নি। ফেয়ারওয়েদার হতাশ হয়ে নিজের মনে মনে ফকীরের কাছে পরাজয় স্বীকার করছিলেন।

ছ'দিন পরে খবর এল, ল্যাণ্ডিকোটালের ছ'মাইল উত্তরে পাহাড়ের ওপারে ফকীরকে কে একজন গুলীর আঘাতে ঘায়েল করেছে। মৃতদেহটা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে এনে দাখিল করেছে ছাউনির দপ্তরে।

পূর্ণ সাফল্যের গর্বে উৎফুল্ল ফেয়ারওয়েদার পুরস্কারের টাকাটা হাতে হাতে চুকিয়ে দিতে চাইলেন।

টাকা নিতে যে এল তাকে দেখে ফেয়ারওয়েদারের ছ'চোখে পাতা পড়ে না। মাথায় পাঠানের পাগড়ি, গায়ে ছোট কুর্তা, তার একপাশে বাঁ দিকের কোমরে চামড়ার বেল্টে বাঁধা পিস্তল,—মিলিটারি ভঙ্গিতে সেল্যুট করে দাঁড়াল দীন মহম্মদ।

এও কি সম্ভব? এই একফোঁটা ছেলেটা মেরেছে ছর্ধর্ষ ফকীরকে, যার ভয়ে বয়স্ক লোকেরাও কম্পমান, যার চতুর বুদ্ধির কাছে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত অভিযান ব্যর্থ হয়েছে? দীন মহম্মদ মেরেছে তাকে?

হ্যাঁ, সাক্ষ্যপ্রমাণে ভুল নেই। অব্যর্থ তার তাক। গুলী লেগেছিল ফকীরের বুকের ঠিক মাঝখানে।

ফেয়ারওয়েদার সিন্দুক খুলে থাকে থাকে সাজানো পাঁচ শ-খানা দশ টাকার নোটের তাড়া তুলে দীন মহম্মদের হাতে দিলেন। সে এক, ছুই করে গুণে এগার শ' টাকা রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিল। বলল, "ওতেই হবে, আর চাই নে।"

তার মানে? জিজ্ঞাসু নেত্রে ফেয়ারওয়েদার তার পানে তাকালেন।

দীন মহম্মদ জানাল, একটা ফট্‌ফটিয়া দেখে রেখেছে পেশোয়ারে। তার দাম এগার শ' টাকা। কালই তা কিনতে রওনা হবে।

পুরাতন একটা ঘটনা স্মরণ করলেন ফেয়ারওয়েদার। সরকারী কাজে শলাপরামর্শের জন্য মাঝে মাঝে পেশোয়ারে যেতেন। ছ' একবার দীন মহম্মদ সঙ্গে ছিল। পেশোয়ারে মিলটন কোম্পানী বিখ্যাত

জে-ডব্লিউ-এ মোটর-বাইকের সেলিং এজেন্ট। বড় রাস্তার পাশে তাদের কাঁচ দিয়ে ঘেরা বিরাট শো-রুম। ভিতরে সারিবন্দী মোটর-বাইক সাজানো। মনে পড়ল, দীন মহম্মদকে সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন।

সব টাকাটাই যে তার প্রাপ্য সে কথা দীন মহম্মদকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। মোটর-বাইকে দাম না হয় এগার শ' টাকা। বাকি টাকায় নিজের ইচ্ছামতো আরও অনেক জিনিস সে কিনতে পারবে। নূতন পিরান, জরির কাজ করা চপ্পল, পশমিনার চাদর, আরও কত কী।

দীন মহম্মদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, আর কিছুতে তার জরুরত নেই। সে পুরুষ মানুষ, মেহনত করতে পারে। নোকরি করে যা পাবে তাতেই দিন গুজারা হবে। বেশী টাকা দিয়ে হবে কী?

কিছুতেই তাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটা নিতে রাজী করানো গেল না।

প্রয়োজনের অধিক টাকা হাতে পেয়েও নিতে চায় না এমন লোক কে কবে দেখেছে? দুর্বোধ্য প্রহেলিকা মানব চরিত্র। সব চেয়ে রহস্যময় এ বালক।

ফেয়ারওয়েদার কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেউ যা পারে নি, তুই তা পারলি কেমন করে?"

দীন মহম্মদের চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়ল। বোধ হয় ভাবল যে, ফকীরকে কে মেরেছে সে সম্পর্কে সাহেবের মনে সন্দেহ আছে। মিনতির সুরে বলল, "আমি মিথ্যা বলি নি, হুজুর। প্রমাণ চান তো—"

ফেয়ারওয়েদার তাকে বাধা নিয়ে বললেন, "না আমি তোকে অবিশ্বাস করি নি। আমি শুধু জানতে চাই, তুই এমন অব্যর্থ নিশানা করলি কেমন করে? ফকীরের গতিবিধি কেউ সঠিক জানতে পারে না। সে যে পাহাড়ের ঐ ঘাঁটিতে ছিল সে-খবর তুই পেয়েছিলি কোথা থেকে?"

"বাঃ রে, সে তো খুব সহজ। সে যে আমার বাবা।"

ফেয়ারওয়েদার বোধ হয় বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। তাঁর মনে হল কে যেন দু' হাত দিয়ে তাঁর গলাটা জোরে চেপে ধরেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হল। বাতাসে কি যথেষ্ট অক্সিজেন নেই? ঘরের মেঝেটা কি দুলছে? পাছে পড়ে যান, দু' হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে চেপে ধরলেন।

দীন মহম্মদ 'আলিকুম সেলাম' বলে শুধু মোটর বাইকের দাম কুর্তার পকেটে পুরে চলে গেল। ফেয়ারওয়েদার টেবিলের উপরে বাকি টাকার তাড়াগুলির পানে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সে-দিনই টেলিগ্রামে বদলীর আদেশ প্রার্থনা করলেন।

ভয়ে? উঁহুঃ, ভয় শব্দ নেই ফেয়ারওয়েদারের অভিধানে।

ঘৃণায়? এতগুলো টাকা সেধে দিতে চাইলেও যে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে তাকে ঘৃণা করবেন তিনি কোন্ মুখে?

তবে?

সেই 'তবে'র উত্তরটা আর শোনা হল না আমার। আমাদের জাহাজ ততক্ষণে ডিয়েপে পৌঁছে গিয়েছে। জেটিতে ভিড়তে আর দেরি নেই। ফেয়ারওয়েদার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, "আমার ব্যাগেজ আছে আপার ডেকে, যাই তুলে নিতে হবে।"

আন্তরিকতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করে বললেন, "প্যারিসে তোমার ছুটির দিনগুলি সুখকর হোক। হ্যাভ্ এ গুড টাইম।"

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মানুষের স্মৃতিশক্তির নানা প্রকারভেদ আছে। কেউ সহজে মনে রাখে সংখ্যা। তারাই গণিতের পরীক্ষায় বেশী নম্বর পায়। কারুর বা মনে দাগ কেটে বসে ঘটনা। তারা বহু পুরানো দিনের ইতিকথা খুঁটিনাটি সহ স্বচ্ছন্দে নির্ভুল বলে দিতে পারে।

আমার স্মৃতিতে মানুষের চেহারা আঁকা হয়ে থাকে দীর্ঘকাল; তাদের নাম তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। পথে-ঘাটে, ক্লাবে, পার্টিতে, অনেক লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা-চেনা মনে হয়, অথচ তাঁদের সঠিক পরিচয় স্মরণে আসে না, আশ্চর্য নয় যে, তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। পনর, বিশ বা পঁচিশ বছর আগে পটুয়াখালী, কিশোরগঞ্জ বা বর্ধমানে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল আজ দেখা মাত্র তাঁদের নামটা বলতে না পারাটা যে নিছক একটা পোজ অর্থাৎ ভড়ং সে-বিষয়ে তাঁদের মনে সংশয় থাকে না। আড়ালে তিক্তচিত্তে মন্তব্য করেন,—বড় চাকরির দেমাক, এমনই বটে! প্রতিবাদ করে লাভ নেই। সৃষ্টিকর্তা আমার স্মরণশক্তিতে যে ঘাটতি ঘটিয়েছেন তার খেসারত কিছু না দিয়ে উপায় কী?

প্ল্যানিং কমিশনের একটা ম্যাচিং-গ্র্যাণ্টের স্কীম নিয়ে রাজ্য-সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সে-উপলক্ষে মাদ্রাজে এসেছিলাম। ফিরতি যাত্রায় মীনাবকম এয়ারপোর্টে প্লেনের অপেক্ষায় ছিলাম। ব্যাগেজ চেক অনেক আগেই হয়ে গেছে। এমন সময়ে মাইকে বিমান-কোম্পানীর ঘোষণা শোনা গেল, তাঁরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন, টেকনিক্যাল কারণে দিল্লীমুখো ফ্লাইট নম্বর চারশ তিন ছাড়তে আধ ঘণ্টা বিলম্ব হবে।

বিমানযোগে যাঁরা হামেশাই যাতায়াত করেন এবং বিমান কোম্পানীগুলির হাঁড়ির খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন "টেকনিক্যাল কারণটা" বেশীর ভাগ সময়েই প্লেনের যান্ত্রিক গোলযোগ বা আবহাওয়ার

অসুবিধা নয়। তার অর্থ কর্মচারীরা আচমকা ধর্মঘট করেছে, এয়ার হোস্টেস আসে নি, পাইলটের মুখে তীব্র মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কিম্বা ঐ ধরনের অন্য কোনো অঘটন যা খোলাখুলি বলা চলে না।

আসল কারণটা যাই হোক, বোঝা গেল, আপাততঃ বসে থাকার পালা। এবং তার মিয়াদটা অনির্দিষ্ট। আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানি টেকনিক্যাল কারণে দেরিটা আধ ঘণ্টা থেকে গড়িয়ে তিন চার ঘণ্টায় দাঁড়ালেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং সময় সংহারের জন্য পঠনযোগ্য কিছু চাই। তারই সন্ধানে বুকস্টলের দিকে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ ঝন্‌ঝনাত আওয়াজ। পিছনে তাকিয়ে দেখি অদূরে একটি মহিলার হাত থেকে রূপার পানের ডিবেটা ছিটকে পড়েছে মেজেতে। পান, সুপুরি ও অন্যান্য মশলা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। মহিলার লজ্জাজড়িত মুখটি চোখে পড়তেই চমকে উঠলাম। এ মুখ তো অচেনা নয়।

একটা বিলাতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা কিনে ফিরে এসে নিজের পরিত্যক্ত পুরু গদিআঁটা আসনটা পুনরায় দখল করে বসলাম। কিন্তু ছবি বা গল্প কোনোটাতেই মনোনিবেশ করা গেল না। সেই হঠাৎ দেখা মুখটির কথা ভেবে চিত্ত কেবলই বিক্ষিপ্ত হতে থাকল। উঠে গিয়ে মহিলা যেখানে বসেছিলেন সেখান দিয়ে বার দুই পাদচারণ করলাম। কিন্তু তিনি শাড়িটা মাথার উপরে এমন টেনে দিয়েছিলেন যে তাঁর মুখটি দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ হল না।

মহিলা বর্ষিয়সী। আমি নিজেও অনেক কাল আগেই পঞ্চাশোর্ধে। কিন্তু বয়স যা-ই হোক না কেন, একজন অজ্ঞাতকুলশীল পরস্ত্রীর দিকে বারে বারে দৃষ্টিক্ষেপের চেষ্টা কোনো পুরুষের পক্ষেই সুরুচির পরিচায়ক নয়। অগত্যা কৌতূহল দমন করতে হল। ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের প্লেনে ওঠার ডাক পড়ল।

শুনেছি বিমানযাত্রায় কারুর গা গুলোয়, কারুর বা কানে তালা লাগে। আমার ঘুম পায়। সহযাত্রীরা যখন খবরের কাগজ পড়েন,

গল্প করেন বা জানালা দিয়ে নীচেকার অরণ্য পর্বত ও জনপদের দৃশ্য দেখেন আমি তখন সীটের উপরে দেহটাকে আধশোয়া ভঙ্গিতে এলিয়ে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা দিই। কিন্তু আজ চোখে ঘুম এল না।

কবে, কোথায় ঐ মহিলাকে দেখেছি সে জিজ্ঞাসা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। এমন তো হতে পারে যে আমার ধারণাটা একেবারেই ভিত্তিহীন; মহিলা সম্পূর্ণ অপরিচিতা। উহুঁ। স্পষ্ট লক্ষ করেছিলাম, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি ত্রস্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। খণ্ডিত মুহূর্তের মধ্যে সে-মুখে যে একটি বিস্ময়মিশ্রিত ভয়ার্ত ছায়া পড়েছিল, সে কি সমস্তটাই আমার দৃষ্টিভ্রম? সেই এক পলকের দেখায় তিনিও আমায় চিনতে পেরেছিলেন বলেই যে আমার কাছে আত্মগোপনের ব্যগ্রতায় পরে আঁচলে মুখ ঢেকে বসেছিলেন সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও যখন পূর্ব পরিচয়ের কিছুই স্মরণে এল না তখন হাল ছেড়ে দিয়ে মনকে বোঝালাম, ধুত্তোর, কোথাকার কে এক বিগতযৌবনা স্ত্রীলোক, তার আইডেন্টিফিকেশানের জন্য আমার মাথাব্যথা কেন?

কী আশ্চর্য! যে মুহূর্তে মন থেকে তার কথাটা জোর করে ঝেড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম ঠিক সেই ক্ষণে কী জানি কোন্ মন্ত্রবলে স্মৃতির বন্ধ দরজাটা আপনি খুলে গেল। নিমেষে তার অতীত পরিচয় সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো আমার মনের পর্দায় প্রতিফলিত হল। বহুদিন আগেকার এক রোমাঞ্চকর নাটিকার নায়িকা কুমারী তরলা বিশ্বাসকে স্মরণ করলাম।

দেশ বিভাগের আগে অখণ্ডিত বঙ্গভূমির যে অংশটা পদ্মা নদীর দক্ষিণে ছিল তারই একটা ছোট মহকুমার ঘটনা। শহরের নাম না বলাই ভালো। সন তারিখের উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সদ্য সেখানে বদলী হয়ে এসেছি। আমার কর্মজীবনের সেটা গড়া-পেটার অধ্যায়, ইংরেজীতে যাকে বলে ফরমেটিভ ইয়ার্স।

সে-কালে ল' এ্যাণ্ড অর্ডার এবং রেভেনিউ, আইন-শৃঙ্খলা ও রাজস্ব ছাড়া আরও অনেকগুলি সরকারী ও আধা-সরকারী কর্তব্যের ভার

থাকতো মহকুমাশাসকের উপর। নৈবেদ্যের চূড়ায় সন্দেশের মতো স্থানীয় হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, পাবলিক লাইব্রেরী জাতীয় সমুদয় প্রতিষ্ঠানের শিরোভাগে তাঁর স্থান। সে-সবের পরিচালন সমিতির তিনি পদাধিকারবলে সভাপতি, সরকারী পরিভাষায় যার নাম এক্সঅফিসিও চেয়ারম্যান।

শহরের একমাত্র মেয়েদের শিক্ষায়তন জুবিলী গার্লর্স স্কুল। তার অবৈতনিক সম্পাদক বৈকুণ্ঠবাবু দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক বয়সে প্রবীণ, পেশায় উকীল, অর্থে ও প্রাতিষ্ঠায় সকলের শ্রদ্ধেয়। বললেন, অবিলম্বে গভর্নিং বডির একটা সভা ডাকা প্রয়োজন। হুজুরের যদি সুবিধে হয় তো আসছে সপ্তাহে।

মাত্র দিন সাতেক হল চার্জ নিয়েছি, এখনও শহরের লোকজন, রীতি-নীতি ও সামাজিক আবহাওয়ার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হয় নি। এরই মধ্যে মিটিং-এর তাড়া কিসের?

তাড়া ছিল। বৈকুণ্ঠবাবু জানালেন, হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে স্কুল কমিটির একটা সংঘর্ষ চলছে। তাড়াতাড়ি মিটিয়ে না ফেললে স্কুলটা নষ্ট হবে।

ব্যাপারটা যথেষ্ট স্পষ্ট হল না। স্কুলে পড়াশুনার ভারটা হেডমিস্ট্রেসের। আইন-কানুন বেঁধে দেন, টাকা-কড়ি যোগান কমিটি। হেডমিস্ট্রেসকে হয় তাঁদের নির্দেশ মানতে হয়, নয়তো যেতে হয়। এর মধ্যে লড়াই-এর প্রশ্ন আসে কোথা থেকে আর তা না থামালে স্কুলের সর্বনাশই বা হবে কেন?

সেক্রেটারী মশায় সবিনয়ে জানালেন, তরলা বিশ্বাস সাধারণ হেডমিস্ট্রেসের মতো নয়; আর পাঁচ-জন প্রধানা-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই চলে না। এখানকার গার্লস স্কুল মানেই মিস বিশ্বাস।

এ-সব উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য কুমারী বিশ্বাসের "সি-আর" অর্থাৎ ব্যক্তিগত সার্টিফিকেটের পক্ষে নিশ্চয়ই মূল্যবান। কিন্তু তাতে আমার প্রশ্নটার জবাব মেলে না। বৈকুণ্ঠবাবু নিজেও বোধ হয় তা' উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করলেন, স্কুলটা শুরু থেকেই ছিল একটা আধমরা

প্রতিষ্ঠান। শিক্ষয়িত্রীরা অযোগ্য, ছাত্রীরা অমনোযোগী, পড়াশুনা প্রায় কিছুই হতো না। যে-দিন থেকে তরলা বিশ্বাস হেডমিস্ট্রেস হয়ে এসেছেন সে-দিন থেকে ধীরে ধীরে স্কুলের চেহারা পালটে গেছে। গত বছর একটি ছাত্রী ডিভিশন্যাল স্কলারশিপ পেয়েছে।

"শুধু তাই নয়, স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, মিস বিশ্বাস এখানকার বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা ডোনেশান ও সিনেমা হাউসের মালিকের কাছ থেকে চ্যারিটি-শো আদায় করে স্কুলের বিল্ডিং ফাণ্ড গড়ে তুলেছেন," সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে যোগ করলেন বৈকুণ্ঠবাবু।

তরলা বিশ্বাসকে চোখে দেখা দূরে থাক, এর আগে তাঁর নামও শুনি নি। সুতরাং এই গদগদ প্রশংসায় অতিশয়োক্তির ভাগ কতখানি জানি নে। কিন্তু স্কুলের পক্ষে তিনি যদি এতই অপরিহার্য, তবে তাঁর সঙ্গে স্কুল কমিটির দ্বন্দ্বটা কিসের?

সম্পাদক মশায় যা জানালেন তার সংক্ষিপ্তসারটুকু এই—তখনকার দিনে ছোট শহরের ছেলে-মেয়েরা ধুতি, সার্ট, পাঞ্জাবী, হাফপ্যান্ট, ফ্রক, শাড়ি যার যা জোটে তাই পরে স্কুলে যেত। দার্জিলিং বা সিমলা, দিল্লীর কনভেণ্টে পড়ুয়াদের মতো টিউনিক তাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। জামা-কাপড়ে যথেচ্ছাচার বরদাস্ত করা নূতন হেডমিস্ট্রেসের স্বভাবে নেই। তাঁর নির্দেশে জুবিলী স্কুলের মেয়েদের পোষাকেও একটা অলিখিত কিন্তু সুস্পষ্ট ফর্ম গড়ে উঠেছিল। সেটা ব্যয়বহুল না হয়েও সুদৃশ। সরল ও সহজসাধ্য। এই নিয়মানুবর্তিতার ব্যাঘাত ঘটলে কঠোর ডিসিপ্লিনে বিশ্বাসী তরলা বিশ্বাস খুশি হবেন না—এটা অপ্রত্যাশিত নয়।

সে-দিন দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রীর ওষ্ঠাধরে অকস্মাৎ লীপস্টিকের রক্তিম প্রলেপ দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন। মেয়েটি ক্লাশের সেরা; ফি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। কিন্তু পড়াশুনায় ভালো হলেই কি নিয়ম ভাঙার অধিকার জন্মায়?

ক্রুদ্ধ হেডমিস্ট্রেস স্কুলের খাতা থেকে মেয়েটির নাম কেটে দিলেন। অনুতপ্তা ছাত্রীর ত্রুটি স্বীকার এবং বারংবার ক্ষমা-প্রার্থনায় দিন তিনেক

পরে উদ্দীপ্ত-রোষ প্রধান শিক্ষয়িত্রী যখন শান্ত হলেন, তখনই অভিভাবকেরা গোল বাধালেন। মেয়েটির কাকা স্কুল কমিটির সদস্য। তিনি হেডমিসট্রেসের লিখিত কৈফিয়ৎ তলব করলেন। কারুর হুমকিতে নত হবেন তরলা বিশ্বাস সে-পাত্রী নন। জবাবে তিনি দু'লাইনের একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। সেটি তাঁর চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার নোটিশ,—লেটার অব রেজিগনেশান।

বোঝা গেল, কারণটা তুচ্ছ এবং বিরোধটা অনাবশ্যক। উভয়পক্ষেই যুক্তির চাইতে জেদ বেশী, অভিযোগের চাইতে উত্তাপ। এ-সব প্রেস্টিজ ইস্যু, মিটিং করে মীমাংসা হয় না। একদিন বিবদমান দুই পক্ষকে নিজের খাশ কামরায় ডেকে আনলাম।

ইংরেজী প্রবাদে বলে, এপিয়ারেন্স নাকি ডিসেপটীভ। হবেও বা। অন্ততঃ তরলা বিশ্বাসকে দেখে রণরঙ্গিণী মনে হয় না। বয়স চল্লিশের ধাপ ছুঁয়েছে, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, চোখে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি, মুখে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ। মহিলা সুন্দরী নন,—মিষ্টি; প্রেটী নন,—প্লেসেণ্ট।

কিন্তু তিনি যে সংকল্পে অবিচল এবং তর্কে সুপটু সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রইল না। মানুষের জামা, কাপড়, পরিধান, প্রসাধন নিতান্তই বাইরের ব্যাপার, সাজ-সজ্জার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অনর্থক বড় করে না দেখাই উচিত এসব কথায় তাঁকে টলানো গেল না। যুগ-পরিবর্তন, শালীনতার ধারাবদল, ব্যক্তিগত রুচি ইত্যাদিকে তিনি আমলই দিলেন না।

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "মাফ করবেন, ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে কি আপনি আপিসে আসেন? কোঁচা দুলিয়ে টেনিসে যান?"

এমন ফ্রণ্ট্যাল অ্যাটাকের—সরাসরি আক্রমণের—জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। শ্রীমতী তরলা আর যাই হোক সার্থকনামা নন।

তাঁর বক্তব্য এই যে তাঁর স্কুলের মেয়েরা গালে রুজ এবং ঠোঁটে রং মেখে বিয়ের নিমন্ত্রণ বা পার্টিতে গেলে তিনি দুঃখিত হবেন, কিন্তু আপত্তি করবেন না। বিদ্যালয়টা লেখাপড়ার স্থান, বিউটি কন্‌টেস্টের নয়। সেখানে সাজপোষাকের একচুল নড়চড় তিনি সহ্য করবেন না।

বিলাত এ্যামেরিকার অতি-আধুনিকতার দৃষ্টান্ত তিনি এক কথায় নস্যাৎ করে দিলেন, "ওদেশেও যে মেয়েরা বিকিনি পরে সমুদ্রের ধারে রোদ পোহায় তারাই হাঁটু অবধি গাউন ও মাথায় টুপি ছাড়া গির্জায় ঢোকে না।"

তর্ক ছেড়ে তাই অন্য রাস্তা ধরতে হল। ঐ মেধাবী মেয়েটির ভবিষ্যৎ, স্কুলের সুনাম, ছাত্রীদের প্রতি তাঁর মাতৃসম স্নেহশীল দায়িত্ব এবং ঐ রকম আরও বাছা বাছা সেন্টিমেণ্ট্যাল আবেদনের দ্বারা অবশেষে জুবিলী গার্লস স্কুলের সংকটমোচন করা গেল।

চার পাঁচ মাস তরলা বিশ্বাসের আর কোনো সাড়া শব্দ পাই নি। স্কুল কমিটির সদস্যেরা যথাপূর্বং স্কুলের ভার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের রুজি-রোজগারে ব্যস্ত এবং মিস বিশ্বাস কঠোর শাসন ও কঠিন পরিশ্রমে ছাত্রীদের বিদ্যার্জনের তদারক করছেন ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

খবরের কাগজে ম্যাট্রিকের রেসাল্ট বেরিয়েছিল। জুবিলী স্কুলের একটি মেয়ে প্রথম দশজনের মধ্যে স্ট্যাণ্ড করেছে। আরও দু'তিনটি একাধিক লেটার পেয়েছে। মোট পাশের হারও গৌরবজনক। স্কুল কমিটির সভাপতিরূপে হেডমিস্ট্রেস্কে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

ধন্যবাদ জানিয়ে তার উত্তর এল। তাতে শিষ্টাচারের চাইতে আন্তরিকতার আভাস অধিক। পত্রের শেষাংশে একটি সসঙ্কোচ অনুরোধ ছিল,—পরবর্তী শনিবার তাঁর বাড়িতে আমার সস্ত্রীক উপস্থিতি প্রার্থনা করেন।

দেয়াল দিয়ে ঘেরা স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যেই এক দিকে শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টারস। পাশাপাশি ছোট ছোট বাড়ি। পাকা দেয়ালের ঘর, করগেটেড টিনের ছাদ, সিমেণ্টে বাঁধানো মেজে। পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ি যেমন হয়, তেমনি। হেডামিস্ট্রেসের বাড়িটি ওরই মধ্যে একটু আলাদা। আয়তনেও বড়। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা আছে। কঞ্চির বেড়ায় ঘিরে সেখানে এক ফালি ফুলের বাগান।

মিস বিশ্বাস নিজেই দোর খুলে অভ্যর্থনা জানালেন।

বসার ঘরটিতে আসবাবের বাহুল্য নেই, পরিচ্ছন্ন পারিপাট্যের চিহ্ন আছে। একদিকে দেয়াল ঘেঁষে একটি নীচু তক্তপোষ। তার উপরে হালকা গদির বিছানা, সাদা ধবধবে চাদরে ঢাকা। খানতিনেক হাতলযুক্ত কাঠের চেয়ার। চেয়ারের পিছনটায় ক্রীম রং-এর কেসমেণ্ট কাপড়ের অড় পরানো। দরজা জানালায় একই রঙের ম্যাচ-করা পর্দা, তার মাথায় পুরানো ঢাকাই শাড়ির পার এপ্‌লিকের টেকনিকে বসানো। ঘরের এক কোণে ছোট জলচৌকির উপরে বৃন্দাবনী ঘটিতে গুটি কয়েক পাতার সঙ্গে শ্বেত গুলঞ্চের একটি প্রস্ফুটিত স্তবক। সব কিছু মিলিয়ে একটি স্নিগ্ধ সহজ পরিবেশ। মনে মনে মহিলার রুচির প্রশংসা করলাম।

কথায় কথায় তরলা বিশ্বাস জানালেন, কলেজে তিনি আমার মেজদির সহপাঠিনী ছিলেন, ডায়োসিশান থেকে একই বছরে বি-এ পাশ করেছেন। সে-সুবাদে আজ ভাইফোঁটার দিনে তাঁর বাড়িতে আমাদের আগমন তাঁর কাছে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

আমি ছেলেবেলা থেকেই হোস্টেলে থেকে মানুষ হয়েছি, সিভিল সার্ভিসের জন্য বিদেশে গেছি এবং ফিরে এসে চাকরির খাতিরে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে নিজের বোনেদের হাত থেকে ফোঁটা নেওয়ার সুযোগই জীবনে বেশী ঘটে নি। তাই আজ পাতানো বোনের কাছে সে সম্ভাবনা আমাকে উল্লসিত করে নি। কিন্তু আমার স্ত্রী অভিভূত হলেন। বেচারীর একটি মাত্র ছোট ভাই এয়ারফোর্সে ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট হয়েছিল। মাস দুই আগে যোধপুরের কাছে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ভাইফোঁটার উল্লেখে তাঁর চোখ দুটি জলে ছলছল হয়ে উঠল।

তরলা বিশ্বাস স্নেহভরে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনি আমাকে দিদি বলবেন, এমন প্রত্যাশা করি নে যদিও সেটা দাবি করলে অন্যায় হতো না। তবে মিলী যে আমার ছোট বোন নয়, একথাটা কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুমেও মানতে রাজী নই।"

এরই মধ্যে তিনি আমার স্ত্রীর আটপৌরে নামটাও জেনে নিয়েছেন।

বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম। মিস বিশ্বাস আমার হাতে কাগজে মোড়া একটি ক্ষুদ্র প্যাকেট দিয়ে বললেন, "সাহেব মানুষকে ধুতি দিয়ে লাভ নেই, সেটা হয় ঝাড়-পোঁছার কাছে লাগবে নয়তো শেষ পর্যন্ত বাবুর্চী, খানসামার ঘরেই যাবে। তাই ভাইফোঁটায় ছুঁচে কাজ করা একটি রুমাল দিলাম। ভয় নেই, ঘুষের দায়ে পড়তে হবে না, আমি বরং মিলীর কাছ থেকে একটা আধ-পয়সা চেয়ে নেব।"

পরিহাসে যোগ দিয়ে বললাম, "সেজন্যে ঘাবড়াই নে। ঘুষ নিলে দোষ নেই, ধরা পড়লেই মুস্কিল। কিন্তু রুমাল দিলে যে ঝগড়া হয় সে-কথা কি আপনি জানেন না?"

"জানি, কিন্তু সে শুধু মেয়েদের বেলায় খাটে, ছেলেদের নয়। মিলীকে অন্য জিনিস দিয়েছি।"

সেদিন হেমন্তের অলস অপরাহ্নের ঘণ্টা দুই সময় তরলা বিশ্বাস সত্যি সত্যি হাসিতে খুশিতে সরস এবং আন্তরিকতায় মধুর করে তুলেছিলেন।

অতি অল্পদিনেই মিলী ও তরলার মধ্যে একটি নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠল।

ম্যাজিস্ট্রেটকে স্থানীয় জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, কিন্তু জড়িত হতে মানা। শাসনকার্যের স্বার্থেই শাসকদের পক্ষে মেলামেশার ব্যাপারে একটু রাশ টেনে চলতে হয়। আমি যে তরলা বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কটা সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয়তার ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার পর্যায়ে উন্নীত করতে ব্যগ্র নই সেটা তিনি অনুমান করেছিলেন। তাছাড়া স্কুল কমিটির সভাপতি ও স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের মধ্যে যে কিছুটা সসম্ভ্রম দূরত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার তিনি চেষ্টা করেন নি। তাঁর মাত্রাজ্ঞান, ইংরেজিতে যাকে বলে সেন্স অব প্রোপোরশান, লক্ষ করে শ্রদ্ধাশীল হয়েছি।

সে-দিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে মিলী খবর দিল, জুবিলী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী অবসর নিয়েছেন, আসছে সপ্তাহেই সে শূন্যপদে নতুন নিয়োগ হবে।

সংবাদটা আমার অজ্ঞাত নয়। দিন তিনেক আগে স্কুল কমিটির আসন্ন মিটিংএর এজেণ্ডা এসে গেছে। কিন্তু সে-খবর মিলীর কাছে পৌঁছলো কী করে?

নিজের কথার জের টেনে মিলী প্রশ্ন করল, "তোমরা কাকে নেবে ঠিক করেছ কি?"

তার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "কেন? তোমার কোনো এ্যাডমায়ারার ক্যাণ্ডিডেট আছে না কি?"

"ফাজলামি রাখো। আমি বলি কি, বাইরে থেকে কাউকে নেওয়ার দরকার কী? ঐ সুধাকেই প্রমোশন দাও না কেন? মেয়েটি দেখতে বেশ, স্মার্ট, সর্বদাই হাসি-খুশি", মিলী প্রস্তাব করল।

আমি স্কুল কমিটির সভাপতির যোগ্য গাম্ভীর্যের ভান করে জবাব দিলাম, "না দেওয়ার গুটি চারেক প্রধান কারণ আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি। এক নম্বর,—সুধা যে কে এবং তার যোগ্যতা যে কী তা জানি নে। দুই,—দেখতে ভালো হওয়াটাই এক্ষেত্রে বেস্ট কোয়ালিফিকেশান নাও হতে পারে; কারণ স্কুলের জন্য একটি সহকারী শিক্ষয়িত্রী চাই,—বিয়ের কনে নয়। তিন—প্রমোশন দেওয়া না দেওয়ার মালিক কমিটি, আমি তার চেয়ারম্যান মাত্র। চার নম্বর—"

মিলী বাধা দিয়ে বলল, "কমিটি তো ভারি স্কুলের দেখাশোনা করেন। সেই যে কথায় বলে, ভাত-কাপড়ের কেউ নয় কিল মারবার গোঁসাই। স্কুল তো চালান তরলাদি।"

সুধা নাম্নী শিক্ষয়িত্রীটি যিনিই হোন তাঁকে প্রমোশন দেওয়ার ব্যগ্রতাটা যে কার এতক্ষণে তা বোঝা গেল। কেসটা তরলা বিশ্বাসের; মিলী নিয়েছে তার ব্রীফ।

পরদিন বাদিনী স্বয়ং অত্র আদালতে হাজির হলেন। সুধা বয়সে ছোট হলেও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের চাইতে যে কত বেশী দক্ষ, ছাত্রীদের শেখাতে তার যে কী বিপুল যত্ন ও অধ্যবসায় তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। কবে কোন ইনসপেকট্রেস অফ স্কুল তাকে কী সাধুবাদ দিয়েছেন তাও উল্লেখ করতে বাকী রইল না।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের নিয়োগ, প্রমোশন ও বরখাস্ত সম্বন্ধে সর্বত্রই কতকগুলি নিয়ম, পদ্ধতি আছে। সিনিয়রিটির প্রশ্নটাও সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না।

সে কথা শুনে তরলা বিশ্বাস জ্বলে উঠলেন। বললেন, "সিনিয়রিটি মানে তো প্রাচীনতা, আগে আসার জোর। তা হলে তো স্কুলের বুড়ী আয়াটাকেই হেডমিসট্রেস করতে হয়; তার চেয়ে পুরানো স্কুলে আর কেউ নেই।"

আমি হেসে জবাব দিলাম, "আপনি ইংরেজী লিটারেচারের ছাত্রী ছিলেন, কলেজে বোধহয় লজিক পড়েন নি। নইলে তুলনাটা যে লাগসই হয় নি সেটা নিজেই বুঝতে পারতেন।"

তরলা বিশ্বাস বুদ্ধিমতী। আমার মনোভাবটা আঁচ করতে তাঁর কষ্ট হল না।

মাস তিনেক পরের ঘটনা। গৃহিনী কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে গেছেন। বাড়িতে আমি একা। আপিস থেকে ফিরে একটা ইংরেজী উপন্যাস নিয়ে বসেছিলাম। সন্ধ্যার তখনও বাকী। কিন্তু বিকেল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তাই তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে এল। নতুন বেয়ারাটা কেরোসীনের পেট্রোম্যাক্সটা জ্বেলে দিতে এসেছিল। বলল, "এক মেমসাব হুজুরসে মিলনে আয়ী হৈঁ।"

"মেম সাহেব? কোথায়?"

সে জানাল, বারান্দায় যেখানে বেতের চেয়ারগুলি আছে, সেখানে বসিয়েছে।

তরলা বিশ্বাস সন্দেহ নেই। স্ত্রীর অনুপস্থিতির কথা কি তিনি জানেন না?

"মিলী তো এখনও কলকাতা থেকে ফেরে নি" বলতে বলতে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই, আগন্তুকা আমার দিকে মুখ ফেরালেন। একী? এ তো মিস বিশ্বাস নন। বছর ত্রিশের একটি তন্বঙ্গী তরুণী। সুদর্শনা।

চেয়ার থেকে উঠে দু'হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "ক্ষমা করবেন,

খুব বিপদে পড়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। আমি সুধা, জুবিলী গার্লস স্কুলের হিস্ট্রী-টীচার।"

নির্জন সন্ধ্যায় স্ত্রীবিরহিত বাড়িতে এক অপরিচিতা যুবতীর একক আগমনে বিব্রত বোধ করলাম।

বিপদ যে কোনো মানুষেরই ঘটতে পারে। তাই বলে বলা নেই, কওয়া নেই অজানা অচেনা মেয়েমানুষ যখন তখন মহকুমা-শাসকের বাংলোতে হানা দেবে? ফটকে পুলিশ পাহারাদারটা করছে কী? আটকায় নি কেন? আমার ম্যাজিস্ট্রেটীয় মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল।

অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললাম, "আপনার বিপদের কথা আপনার হেডমিস্ট্রেস্‌কে বলুন। তাঁর উপরে স্কুলের সেক্রেটারী আছেন, তাঁকে জানান। চোর, গুণ্ডার ব্যাপার হলে থানায় ডায়েরী করতে পারেন। শহরের প্রত্যেকটি লোকই যদি তার নালিশ বা সমস্যা নিয়ে রাত বিরাতে সোজা আমার কাছে দৌড়ে আসে তবে তো এ্যাডমিনিস্ট্রেশান চলে না।"

সুধা নিশ্চয়ই এমন রূঢ় আঘাত প্রত্যাশা দূরে থাক, কল্পনাও করে নি। সে ভীত চকিত স্বরে বলল, "হেডমিস্ট্রেস্ নিজেই যে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। না, আর কাউকে দিয়েই কিছু হবে না। শুধু আপনিই আমাকে রক্ষা করতে পারেন।" বলতে বলতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হলো, দুই কোমল গণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার অশ্রুসিক্ত ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল। একটা চেয়ার টেনে বসলাম। শোনাই যাক না ব্যাপারটা কী?

সুধা মেয়েটি প্র্যাকটিক্যাল। ফেনিয়ে ফেনিয়ে কাহিনীকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করল না। শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু বিবৃত করল।

অল্প বয়সেই সুধার বিয়ে হয়েছিল। ভাগ্যদোষে বছর না ঘুরতেই স্বামীহারা। বর পূজার ছুটিতে গ্রামে আসছিল, পথে ধলেশ্বরীতে তার নৌকাডুবি হলো। অন্য যাত্রীরা কয়েকজন রক্ষা পেল, কারুর বা মৃতদেহ পরে সনাক্ত হলো। শুধু সুধার স্বামীর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

সবাই ধরে নিল, নিশ্চয়ই নদীর প্রবল জলস্রোত তার প্রাণহীন

শরীরটাকে অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু সুধার শাশুড়ী সে-কথা মানলেন না। গৃহদেবতা নাকি তাঁকে স্বপ্নে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর ছেলে ডুবে মরে নি, ফিরে আসবে।

গ্রামে খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটা কলোনী ছিল। সেখানকার এক বেলজিয়ান মাদারের দয়া হলো। তিনি সুধাকে লেখা-পড়া শেখালেন। মিশনের স্টাইপেণ্ড দিয়ে তাকে ম্যাট্রিক থেকে বি-এ অবধি পড়ালেন। অদৃষ্ট বোধহয় সুপ্রসন্ন হয়েছিল, বিনা সুপারিশেই জুবিলী স্কুলের চাকরিটা জুটে গেল। সে শুধু জীবিকা নয়, নতুন জীবনও বটে। হেডমিস্ট্রেস্ তরলা বিশ্বাস তো কেবল সুধার উপরওয়ালা নন, তিনি তার আত্মীয়ের অধিক। স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, সতর্ক প্রহরিণীর সজাগ দৃষ্টি দিয়ে তিনি সুধাকে নিরাপত্তায় ঢেকে রেখেছেন। এম-এ পড়ার জন্য তাকে স্কুল থেকে দীর্ঘ স্টাডি লীভ পাইয়ে দিয়েছে কে? পড়ার বই যুগিয়েছে কে?

স্কুলের কোয়ার্টার্সের ছোট বাড়িটিতে সুধা শাশুড়ীকে নিয়ে থাকে। বউ রান্নাবান্না করে, স্কুলে যায়, ছাত্রীদের পড়ায়, এগজামীনের খাতা দেখে। শাশুড়ী ছেলের আশায় মালা জপেন, ঠাকুর-দেবতার মানত করেন, গণৎকারকে হাত দেখান, সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই পা জড়িয়ে ধরেন।

বৃদ্ধা বিবিনগরে বুড়োশিবের মেলায় গিয়েছিলেন। দিন কুড়ি আগে সেখান থেকে এক স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছেন। তিনি নাকি সিদ্ধ পুরুষ, ভগবানের অবতার বললেই হয়, যোগবলে বৃদ্ধার ছেলের সন্ধান বলে দেবেন। সেই থেকে সুধার বাড়িতে তাঁর ভজন পূজন চলছে।

স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে সুধার কোনো সংশয় নেই। কিন্তু পুত্র শোকাতুরা জননী যদি অলীক আশা নিয়ে ভুলে থাকে তবে তাতে সে বাধা দেবে কেন? সাধু-সন্ন্যাসীতে সুধার মতি নেই, ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নিয়েও সে কখনও মাথা ঘামায় নি। কিন্তু বৃদ্ধা শাশুড়ীর মনে আঘাত দিতে তার বিবেকে বাধে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে দু'বেলা স্বামীজীর পায়ের ধুলা নেয়, অনেক রাত জেগে তাঁর কীর্তন শোনে, তাঁর প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে মুখে নেয়।

স্বামীজী বয়সে তরুণ, চেহারাটাও ভালো। যোগবল বা ঐশী শক্তি তাঁর আছে কি নেই তা সুধা জানে না। তবে লক্ষ করেছে, সিল্কের গেরুয়া ছাড়া তিনি পরেন না এবং সুস্বাদু আহার্যেও তাঁর বিতৃষ্ণা নেই।

খবরটা তরলা বিশ্বাসের কানে যেতে তিনি বিচলিত হলেন। তিনি সুধাকে ডেকে বললেন, এই দণ্ডে স্বামীজীকে বিদায় করা চাই। কিন্তু সুধার শাশুড়ী তাই শুনে অনশন শুরু করলেন। বললেন, স্বামীজীকে কেউ কিছু বললে, তিনি দেয়ালে মাথা কুটে প্রাণ দেবেন।

স্কুলের নিয়মে শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার্সে তাদের নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য পুরুষের বসবাস নিষিদ্ধ। তরলা বিশ্বাস আল্‌টিমেটাম দিয়েছেন, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে হয় স্বামীজী নয়তো সুধা আর তার শাশুড়ীকে কোয়ার্টার্স ছাড়তে হবে। স্কুলের চাকরিটিও যাওয়ার আশঙ্কা। নিয়ম বা প্রিন্সিপলের বেলায় তরলাদি কত নির্মম ও কঠোর হতে পারেন তা সুধার অজানা নেই। আর কোনো দিকে কোনো পথ দেখতে না পেয়ে সে মরীয়া হয়ে এখানে ছুটে এসেছে।

সুধার ইতিবৃত্ত শেষ হল। সহানুভূতির স্বরে বললাম, "আপনার অবস্থাটা দুঃখজনক। কিন্তু হেডমিস্ট্রেস্‌কে তো দোষ দেওয়া চলে না। স্কুলের সুনাম, ছাত্রীদের স্বার্থ—এসবের দায়িত্ব তো তাঁরই। খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি কোনো রিস্ক মানে ঝুঁকি নিতে চান না। তা ছাড়া, তাঁর উদ্বেগের কারণটা অন্যত্র হওয়াও অসম্ভব নয়।" কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলতে সঙ্কোচ হল।

কিন্তু মেয়েটির বুদ্ধি আছে, ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল। তার কর্ণমূল লাল হয়ে উঠল। চোখ নীচু করে লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলল, "সে আমি জানি। তরলাদি আমার নিজের বড় বোনের মতো। আমার গভীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমার সত্তর বছরের বৃদ্ধা শাশুড়ীকে আমিই বা ফেলি কেমন করে?"

সমস্যাটা দুরূহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সুধা চায় কী?

বেশী কিছু নয়। আর চারদিন পরেই মঙ্গলবার অমাবস্যা। স্বামীজী আশা দিয়েছেন ঐ দিন মধ্যরাত্রে হোমের পরে বৃদ্ধাকে তার

নিরুদ্দিষ্ট ছেলে এনে দেবেন। নয়তো তার আগেই সরে পড়বেন। সুধা ঐ কটা দিনের সময় চায় মাত্র।

সুন্দর মুখের সর্বত্র জয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটা আমার স্মরণে ছিল। কিন্তু সুধার বিপদে সাহায্য করতে যে রাজী হলাম সে শুধু তার কমল আননের খাতিরে নয়।

পরদিন রবিবার। ছুটির দিন, আপিসের তাড়া নেই। তাই একটু বেলা অবধি ঘুমিয়েছিলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ বিছানা ছাড়তেই শুনলাম, বৈকুণ্ঠবাবু অনেকক্ষণ ধরে গোল কামরায় অর্থাৎ ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছেন। দর্শনপ্রার্থী।

কারণটা অনুমান করতে কষ্ট হল না। ভদ্রলোক স্বামীজী-সমস্যায় দিশেহারা হয়ে এই সকালবেলায় পরামর্শ চাইতে ছুটে এসেছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই অসহায় কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "গালর্স স্কুলের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ইলোপমেণ্ট।"

চমকে উঠলাম। কৈ, সুধা মেয়েটিকে তো এমন মনে হয় নি। বরং তার চেহারা ও আচার-আচরণে এমন একটি সুকুমার সারল্যের ছাপ আছে যা সহজেই মনে আস্থা সৃষ্টি করে।

কোন এক ইংরেজ কবি বলেছেন, মানুষের মুখ হচ্ছে তার মনের দর্পণ। মনে হয়, নিতান্তই বাজে কথা। সৃষ্টিকর্তা নরনারীর অন্তরের ক্রূরতা ঢেকে রাখার জন্যেই বোধহয় তাদের মুখমণ্ডলে দেন নিষ্কলুষতার রমণীয় আবরণ। বিস্বাদ ওষুধের ট্যাবলেটের গায়ে যেমন নানা রঙের সুগার কোটিং। অপাঠ্য উপন্যাসের যেমন সুচিত্রিত ঝলমলে মলাট।

বিস্ময়ের আকস্মিকতায় দু'জনেই নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। পরে ধীরে ধীরে মন্তব্য করলাম, "সুধা যে এমন কাজ করতে পারে তা সত্যি আমি ভাবি নি।"—

বৈকুণ্ঠবাবু অবাক হয়ে বাধা দিলেন। তাড়াতাড়ি সংশোধন করলেন, "সুধা? না, না, সুধা নয়। ইলোপ করেছে মিস বিশ্বাস, আমাদের হেডমিস্ট্রেস্।"

স্কুলের সেক্রেটারী মশায়কে নিরীহ অহিংস প্রকৃতির ভালমানুষ বলে

জানতাম। তিনি অতর্কিতে আমার মাথায় একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে মারলেন। অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য আমার তাই মনে হল। মাথাটা বুঝি চৌচির হয়ে টুকরো টুকরো মেজেতে ছড়িয়ে পড়েছে। নইলে চিন্তাশক্তি রহিত হলাম কেন?

খানিক সামলে উঠে ধীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করলাম। বৈকুণ্ঠবাবু হন্তদন্ত হয়ে এত প্রত্যূষে পরিহাস করতে এসেছেন, এমন মনে করা কঠিন। ভুল শুনি নি তো?

বৈকুণ্ঠবাবু জানালেন, খবরটা পেয়েই সুধার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে সুধার শাশুড়ীর কাছে শুনলেন, কাল দুপুরে হঠাৎ মিস বিশ্বাস এসেছিলেন। উগ্রমূর্তি। দরোয়ান ডেকে স্বামীজীকে তক্ষুনি স্কুল কম্পাউণ্ডের বাইরে বের করে দেবেন, শাসালেন। সুধার শাশুড়ীর কান্নাকাটিতে কান দিলেন না। সোজা ঢুকলেন স্বামীজীর ঘরে। আলনা থেকে তাঁর গেরুয়া বসন ও উত্তরীয় টান মেরে উঠোনে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন। স্বামীজী আসন থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

সুধার শাশুড়ী শুনেছেন, যোগী ঋষিদের চোখে থাকে তপস্যার আগুন, সে আগুনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবে হেডমাস্টারনীর এমন সাধ্য কী? তরলা বিশ্বাস থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর হম্বি-তম্বি উবে গেল। তার পরে কী ঘটেছে তা' সুধার শাশুড়ী জানেন না। তবে লক্ষ করেছেন, অনেকক্ষণ মিস বিশ্বাস স্বামীজীর কাছ থেকে নড়েন নি। নিশ্চয়ই নিজের অপরাধের জন্য পায়ে ধরে মহাপুরুষের ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

সন্ধ্যেবেলা মিস বিশ্বাসকে আবার আসতে দেখে বৃদ্ধা পুলকিত হলেন। সাধু-সন্তদের লীলা এমনই বটে! তাদের নামে শিলা জলে ভাসে, মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। স্বামীজীর অলৌকিক শক্তি যে নাস্তিক তরলা বিশ্বাসের মনেও ভক্তির উদ্রেক করেছে সে বিষয়ে সুধার শাশুড়ীর মনে সন্দেহ রইল না।

সুধা কী এক জরুরী প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিল, এসব কিছুই জানত

না। আজ সকালে অন্যদিনের মতো স্বামীজীর পূজার উপকরণ যোগাতে গিয়ে দেখে, ঘরের দরজা খোলা, স্বামীজী উধাও।

অদূরে হেডমিস্ট্রেসের শয়নকক্ষেও শয্যা শূন্য, তরলা বিশ্বাস নিরুদ্দেশ।

আমার এক বন্ধু কেমব্রীজ থেকে সাইকলজিতে ডক্টরেট করেছিলেন। ফ্রয়েড গুলে খেয়েছেন। অনেক বছর পরে মিস বিশ্বাসের কাহিনী শুনে বললেন,—…।

স্মৃতিমন্থনে ছেদ পড়ল। এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠ শোনা গেল,— "লেডীজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন,—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেন পালামে নামবে। প্লীজ, ফাসন্ ইওর সীট বেল্টস এ্যাণ্ড এক্সটিংগুইশ ইওর সিগারেটস।"

———